উলু.

মনোজ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

* * * * * * * কলিকাতা-১২ * * * * * * *

দ্বিতীয় সংস্করণ—চৈত্র, ১৩৫৭

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫৫

দুই টাকা চার আনা

গল্পগুলি বারো/তেরো বৎসর আগে বিভিন্ন মাসিক-পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

শ্রীপ্রতাপকুমার সিংহ

প্রিয়বরেষু

সাম্প্রতিক বই—

নবীন যাত্রা "নিপুণ কাহিনীকার হিসেবে মনোজ বসুর তুলনা নেই। অযথা চরিত্রের সমাবেশ নয়, মনগড়া পরিবেশের সাহায্য নয়, ঋজু বলিষ্ঠ প্রকৃতির কয়েকটি চরিত্র—দু-একটি কথায় যারা পাঠকচিত্ত অনায়াসে জয় করে নেয়। সামান্য কয়েকটি আঁচড়, একটি দু'টি কথা, কিন্তু তাতেই সম্পূর্ণ হয় ছবি। বাড়তি রং ফলাবার কোন প্রয়োজন হয় না। কোন চরিত্রের প্রতি অবহেলা যেমন নেই, তেমনি কোন চরিত্রের ওপর অহেতুক দরদের প্রয়োজন হয় না। সেই কারণেই নির্মল মাস্টার আর ইন্দ্রাণী দেবীর পাশাপাশি ফুটে উঠে ভীম সর্দার আর হৃদয় পিওন, প্রসন্ন পণ্ডিত আর শঙ্করীবালা।

লক্ষ্মণ-যাত্রার স্বল্প পরিসরকে নবীন যাত্রার আদিগন্ত পরিসরে রূপান্তরিত করা—এ শুধু মনোজ বসুর লেখনীতেই বুঝি সম্ভব'—**দেশ**। তিন টাকা।

দিল্লি অনেক দূর নবলব্ধ স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা সর্বাধুনিক গল্পসংগ্রহ। দুই টাকা।

খদ্যোত 'ছোট গল্প বলিতে যাহা বোঝায়, এগুলি ঠিক তাহাই। ছোট এবং গল্প দুইই। প্লটের চমৎকার বিস্ময়। রস চরম ঘনীভূত। দীপ্তি হীরকের, খদ্যোতের মিটিমিটি নহে। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে এত ছোট করিয়া গল্প জমাইবার এই বিস্ময়কর কুশলতার প্রতিদ্বন্দ্বী সংখ্যা বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ। গল্পলেখক মনোজ বসুকে বুঝিতে হইলে এ বইখানি অবশ্যপাঠ্য'—**যুগান্তর**। দুই টাকা।

উলু

উলু। উলু! উলু!

মেয়েরা উলু দিতেছে। শিবনাথেরও যেন নবযৌবন ফিরিয়া আসিল। বৈঠকখানা পার হইয়া একেবারে লাফাইতে লাফাইতে তিনি তাদের মধ্যে গিয়া পড়িলেন।

ও কি হচ্ছে? ওরে শালীরা, একি লগ্ন-পত্তোর হচ্ছে—না, পাকা দেখা?

মেয়েরাও হারিবার পাত্র নয়। কমলা মুখ ঘুরাইয়া বলিল, তার চেয়ে বেশি, দাদু। শুভদৃষ্টি হচ্ছে। বর ঐ চারচোখে তাকিয়ে তাকিয়ে মেয়ের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিচ্ছে। নাম ভাঁড়িয়ে কি আর আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া যায়?

পরাস্ত হইয়া শিবনাথ তখন বলিলেন, দে, তবে খুব করে উলু দে। এ ভাঙা ঘরে দশ বছর তো হয়নি ও-পাট!

বলিয়া হাসিতে গিয়া বুড়া চোখ মুছিলেন।

দশ বছর আগেকার সে ঘটনা মনে পড়িলে চোখে জল আসিবার কথা বটে। শিবনাথের একমাত্র ছেলে সন্ন্যাসী হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। ঘরে অতুল রূপ লইয়া পুত্রবধূ যোগিনী সাজিল। গৌরী তখন বছর পাঁচেকের। সেই গৌরীর বিয়ে, দিন-ক্ষণ সমস্ত স্থির, টাকাকড়ির কিছু অগ্রিম লেন-দেন হইয়া গিয়াছে। আজ হঠাৎ বরের ক-জন বন্ধু মেয়ে

দেখিতে আসিয়াছেন। এবং উঁহাদের সঙ্গে বর নাকি আসেন নাই, তিনি কিছুতেই আসিলেন না, তাঁর নাকি ভয়ানক লজ্জা—ইত্যাদি ইত্যাদি।

অন্দর হইতে শিবনাথ পুনশ্চ বৈঠকখানায় গিয়া দাঁড়াইলেন। ওদিকে তখন মহা মুশকিল, মেয়ে কিছুতে মুখ তুলিবে না। শিবনাথ মিনতি করিতে আসিলেন, ও গরবী দিদি, কথা শোন্, কিসের এত লজ্জা? আচ্ছা, আমার দিকে চা দিকি—

এত পীড়াপীড়ি—গৌরীর ফর্সা মুখ একেবারে রাঙা হইয়া গিয়াছে, মেয়ে ঘামিয়া খুন। চেষ্টাচরিত্র করিয়া এক একবার মুখ তুলিতে যায়, খানিক উঠিয়া আবার নত হইয়া পড়ে, মুখ সে কিছুতে তুলিতে পারিল না।

বন্ধুরা সদয় হইয়া বলিল, থাক্, থাক্, ঐ হয়েছে—

শিবনাথ হাসিয়া বলিলেন, বড্ড লজ্জা। আজকালকার মেয়ের মতো নয়। এই বুড়োর সঙ্গে থেকে থেকে একেবারে যেন আদ্যিকালের বুড়ী হয়ে উঠেছে। তারপর সকলের পিছনের চশমা-চোখে নিতান্ত গোবেচারা গোছের ছেলেটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাকে একটু উঠতে হবে, দাদা।

যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে আগন্তুকেরা সকলেই এমনি ভাবে তাকাইল।

শিবনাথ বলিলেন, মানে, আমার ছোট মেয়ে কালই এখান থেকে চলে যাচ্ছে জামাইয়ের সঙ্গে সিমলা পাহাড়ে। বিয়ের সময়ে থাকতে পারবে না। সে একবার একটু ভাল করে দেখতে চায়।

নিশিকান্ত মল্লিক মহাশয় ওপাড়ার একজন মাতব্বর ব্যক্তি। তিনি আসিয়াছিলেন। হাসিয়া বলিলেন, পাত্র কনে দেখতে এসেছে, আর পাত্রী বুঝি বর না দেখে ছেড়ে দেবে!

বন্ধুরা তুমুল আপত্তি করিতে লাগিল।

বললাম তো—পাত্র আমাদের মধ্যে নেই। আমরা কি মিছে কথা বলছি মশাই?

সে আমরা বুঝলাম। কিন্তু ওরা যে শোনে না। শিবনাথ নেপথ্যের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, ওরা ঐ ওঁকে পাঠিয়ে দিতে বলছে।

বন্ধুরা চোখ টেপাটেপি করিতে লাগিল, এবং তাদের দিকে করুণ অসহায় দৃষ্টি ফেলিয়া চশমাধারী উঠিল।

অন্দরে মহা সোরগোল।

ও গৌরী, দেখসে এসে। কোথায় গেলি হতভাগী, বর পছন্দ করবি আয়—

মেয়ে এক-আধটি নয়, পনের বিশ কি তারও বেশি। নানা বয়সের। তাদের মধ্যে পড়িয়া সভয়ে ছেলেটি বলিল, আজ্ঞে, আমি বর নই—

সে হচ্ছে। আস্তিনটা তোল দিকি।

দেখিতে ভাল মানুষ হইলে কি হয়, আসলে কিন্তু ছেলেটি মোটেই সে রকম নয়, অধিকতর ভয়ের ভঙ্গি করিয়া বলিল, আজ্ঞে না। আস্তিন গুটিয়ে কি হবে? দৃষ্টিটা ছিল বিশেষ করিয়া খুব স্থুলকায়া একজনের দিকে। বলিল, আপনাদের সঙ্গে পেরে উঠব না, আমি আপোষে হার মানছি।

সুধা আগাইয়া আসিয়া বলিল, উনি কে—জান?

না—

তোমার বউয়ের ছোটপিসি। তা হলে তোমারও পিসি হলেন। উনিই তোমায় দেখতে চেয়েছিলেন।

ছেলেটি মনে মনে জিভ্ কাটিল। সুধা তখন আস্তে আস্তে তার হাতের জামা সরাইয়া দিয়া বলিল, এই যে জতুক রয়েছে। ও জুয়োচোর, তুমি ঢাকলে কি হয়? ঘটক যে ফাঁস করে দিয়েছে। তোমার চোখে চশমা, হাতে জতুক, নাম নবনী। মিথ্যে নাম বলবার শাস্তি এবার কি হবে বল তো?

হাতে-হাতে ধরা পড়িয়া নবনীর আর কথা বলিবার জো রহিল না। বিজয়ীর দল তখন শাসাইতে লাগিল, শাস্তি দেবার জনকে ডাকছি এখুনি। দেখ তোমার কি হয়। গৌরী—গৌরী!

ভাঙাচোরা অতি পুরানো প্রকাণ্ড দালান। তাহারই মধ্যে পাথরের মতো ভারী কালো হাঙরমুখো খাটেব উপব গদি ও সেকেলে জাজিম পড়িয়াছে। বর সেইখানে শাস্তির প্রত্যাশায় বসিয়া রহিল। কিন্তু কোথায় গৌরী?

পাতি-পাতি করিয়া এঘর ওঘর সমস্ত খোঁজা হইল। একটা জায়গায় বালিশ বিছানা গাদা করা, দুষ্ট মেয়ে করিয়াছে কি—একদম তার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, ধবিবে কাহারো সাধ্য কি! সকলে খুঁজিয়া মরে—সে এক একবার মুখ বাড়াইয়া চোখ মিটি-মিটি করিয়া মজা দেখে, কাছাকাছি কেহ আসিলে তখনই আবাব লুকাইয়া পড়ে। কিন্তু একবার কেমন একটু অসাবধানে গোটা তিন-চার বালিশ দুমদাম কবিয়া মেজেয় পড়িয়া গেল। আর রক্ষা আছে! ধরিয়া ফেলিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে তাকে লইয়া চলিল।

ঝুম-ঝুম-ঝুম পায়ের তোড়া বাজিতেছে। প্রায় দোরের গোড়া অবধি পৌঁছিয়াছে, নবনী তখন যুক্তকবে কাতর হইয়া কহিল, আমার অন্যায় হয়েছিল, মাপ করুন।

কিন্তু ততক্ষণে মেয়ে আসিয়া লজ্জিত মুখে মেজে লইয়াছে।

ছোট পিসি হাসিয়া ডাক দিলেন, ধূলোয় বসিস নে। উঠে আয় খাটের উপর।

কমলা কহিল, ইস, পোড়ারমুখী লজ্জায় আর বাঁচেন না! মনে না ধরে, দাদুকে বল। এখনো সময় আছে।

অনেক জোর জবরদস্তি করিয়াও মেয়েকে উঠানো গেল না। তখন ছোট পিসি গিয়া বরের হাত ধরিলেন। তুমি বাবা, তবে একটু নিচে নেমে এস। আমার বড় সাধ একটু পাশাপাশি বসিয়ে দেখে যাই।

শিহরিয়া নবনী বলিল, না—না।

সুধা বলিল, আপত্তিটা কি ভাই? দু-দিন আগে আর পরে। পিসিমা এত করে বলছেন। ওতে কোন দোষ নেই। এস—

অবশেষে উঠিতেই হইল। সকলে জোর করিয়া গৌরীর ঘোমটা খসাইয়া দিল। দুটিতে অপরূপ মানাইয়াছে। কে বেশি ভাল, তুলনা করিয়া বলিবার জো নাই। দৃষ্টি আর ফিরানো যায় না।

ছোট পিসির চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। এমন রাজ-রাজেশ্বরী মেয়ের বাপ না জানি কোন দূরদেশে ছাই-ভস্ম মাখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গাঢ়স্বরে বলিলেন, চিরজীবী হও তোমরা। দু-জনের চিবুকে হাত ঠেকাইয়া আশীর্বাদ করিলেন।

বর ধীরে ধীরে উঠিয়া আবার খাটের উপর গিয়া বসিল। ছোট পিসি পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন। কেমন দেখলে, বল বাবা। আমি একবার কানে শুনে যাই। দেখতে তো পাব না।

ভাল।

সুধা রাগিয়া উঠিল। শুধু ভাল? ইঃ, নিজের একটুখানি কটা

চামড়া আছে কিনা—সেই দেমাকে বাঁচেন না! মেয়ে তো তোমরা ডজন ডজন দেখেছ, শুনত এমনটি আর দেখেছ কোথাও?

মুখ টিপিয়া নবনী বলিল, কিন্তু দোষও আছে—

ছোট পিসি শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন, কি দোষ বাবা?

আপনি কেন? আপনি চলে যান, পিসিমা। আমি আর-সকলের সঙ্গে কথা বলছি। বলিয়া সেই আর-সকলের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, ঐ গৌরী-টৌরী—সত্যযুগের নাম চলবে না। নাম বদলাতে হবে।

এই? চলিয়া যাইতে বলিলেও ছোট পিসি এক পা নড়েন নাই। এতক্ষণে তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। বলিলেন, তোমাদের যে রকম খুশি—বিয়ের সময় সেই নাম দিয়ে নিও। ও তো আজকাল হচ্ছেই। ঐ যে হালদারদের পটলি, বিয়ের সময় তার নাম হয়ে গেল সুলেখা দেবী।

সকলেই খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বর তখন চুপি চুপি কহিল, বন্ধুরা বললেন, নামটা মীরা হলেই যেন—

মীরা? মীরাবাই? কমলা একেবারে হাততালি দিয়া নাচিয়া উঠিল। বলিল, কিন্তু আমাদেরও একটা আপত্তি আছে বর মশাই।

বর সপ্রশ্ন ভাবে চহিল।

কমলা বলিতে লাগিল, তোমারও নাম ঐ নবনী-টবনী চলবে না ভাই। তোমার নাম হবে কুম্ভ সিং।

সুধা টিপ্পনী কাটিল, শূন্য কুম্ভ। যে রকম বক-বক করে।

যে আজ্ঞে—বলিয়া বর তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে ঘাড় নোয়াইল।

কমলা বলিল, আরও আছে—

হুকুম হোক।

পালকি চেপে বিয়ে করতে আসা চলবে না।

নবনী বলিল, পালকি হবে না। নৌকোর ব্যবস্থা হয়েছে।

উঁহু, তা-ও চলবে না। হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কমলা বলিল, ঘোড়ায় চড়ে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে আসতে হবে। মশাল জ্বলবে, জয়ঢাক বাজবে, মাথায় উষ্ণীষ ঝলমল করবে—

কিন্তু আমি সে রাজসজ্জা দেখতে পাব না! ছোট পিসির মুখভরা আনন্দদীপ্তির মধ্যে আবার অশ্রু চকচক করিয়া উঠিল। বলিলেন, যাই হোক বাবা, গৌরীকে তুমি আদর-যত্ন কোরো। বড্ড অভিমানী। বাপ থেকেও নেই, হতভাগী বড্ড ভালবাসার কাঙাল।

বর ও বরের বন্ধুরা চলিয়া গিয়াছে। মেয়েরা ধুপধাপ বাহিরের ঘরে আসিয়া কলকণ্ঠে শিবনাথের সম্বর্ধনা করিল।

চমৎকার! সত্যি দাদু, তোমার পছন্দ আছে। এ মাণিক কোথা থেকে খুঁজে-পেতে আনলে?

কিন্তু উহাদের বয়স এমনি, সোজা কথাটারও বাঁকা মানে হইয়া যায়। শিবনাথ বলিলেন, ঠাট্টা করছিঁস?

নিশিকান্ত মল্লিক তখনো বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন। নল ফেলিয়া উৎসাহের প্রাবল্যে খাড়া হইয়া বসিলেন। বলিলেন, ঠিক ধরেছিস তোরা। কেবল রাঙা-মুলো, ভেতরে কিছু না। আমি তাই বলছিলাম দাদাকে।

ছোট পিসি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, না মল্লিক মশায়, তা কেন? আলাপে ব্যবহারে বিদ্যেয় চেহারায় ছেলে একেবারে হীরের টুকরো।

হা-হা-হা করিয়া প্রবল হাসির চোটে বক্তব্যের শেষটা মল্লিক উড়াইয়া দিলেন। বলিলেন—এদিকে ভাঁড়ে যে মা ভবানী—এক কাঠা জমাজমি নেই, ঘরে ছুঁচোয় তে-রাত্তির করে—সে খবর জানিস ?

শিবনাথ দুঃখিত স্বরে কহিলেন, কিন্তু সর্বাঙ্গসুন্দর পাই বা কোথায় ?

সুধার মুখে কিছু আটকায় না। তৎক্ষণাৎ কহিল, কেন, এই মল্লিক মশায়। ঘরদোর বিষয়-সম্পত্তি, নাতিপুতি বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে এমন কোথায় মিলবে ?

যাঃ ফাজিল! বলিয়া শিবনাথ তাড়া দিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তা হলে পছন্দ হয়েছে তোদের ? যাক, বাঁচলাম। ও যে আমার কত সাধের গরবিণী—ঐ দুর্গা-প্রতিমা কি যার তার হাতে দিতে পারি ?

কমলা বলিল, তুমি তো শিবঠাকুর আছ দাদু, অন্যের হাতে দিতে গেলে কেন ?

চেষ্টার কি কসুর করেছি ? মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়, বলে—বুড়ো। কিছুতে রাজি হয় না।···ও কে রে ? ও গৌরী, ও গরবী, ও গরবিণী, এদিকে এস। বলে যাও বর পছন্দ হল কিনা।

গৌরী জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঝুম-ঝুম করিয়া তোড়া বাজাইয়া পলাইয়া গেল।

•

বিয়ের দিন। সেই ভাঙ্গা বাড়ির চেহারা বদলাইয়াছে, জঙ্গল একদম নাই, বৈঠকখানার ইট-বাহির-করা দেওয়ালের উপর লাল-নীল কাগজ আঁটা হইয়াছে। ভিতরের উঠানে মস্ত সামিয়ানা, ফুল দেবদারুপাতা দিয়া বিবাহ-আসর সাজানো। সকাল হইতে ঢোল আর কাঁসি পাড়া সরগরম করিয়া তুলিয়াছে।

শিবনাথ অন্দরে আসিয়া ঘন-ঘন তত্ত্ব লইতেছেন।

আহা, দিদির আমার মুখ শুকিয়ে গেছে। একটু দুধ খেতে দাও। ওতে কিছু দোষ হবে না। দাও বউমা, দাও।

মেয়ের মার যদি বা একটু মন নরম হয়—কিন্তু এই বিয়ে উপলক্ষে শিবনাথের ছোট বোন আসিয়াছেন, নাম কাদম্বিনী, তাঁর একেবারে ধনুকভাঙা পণ, যা বিধি আছে একচুল তার এদিক-ওদিক হইবে না। একদিন না খাইলে কেহ আর মরিয়া যায় না।

বড় সুন্দর পিঁড়ি চিত্র করা হইয়াছে ; আলপনার বড পদ্মটি যেন সত্য সত্যই একটি শ্বেতপদ্ম হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিবনাথ মহা আনন্দে চেঁচাইয়া বাড়ি মাৎ করিতে লাগিলেন।

ও দিদি, কোথায় পালালি গো ? এদিকে আয়।

কি দাদু ?

আয়। ঐ পদ্মটার উপর কমলে কামিনী হয়ে একবার দাঁড়া দিদি, আমি দেখি।

যাঃ—বলিয়া পলাইতে যাইতেছিল, এবারে মা আসিয়া হাত ধরিলেন। তাঁরও যেন ঐ ইচ্ছা। আনন্দদীপ্ত মুখে বলিলেন, বস্ না একটু—বাবা বলছেন।

গৌরীর তবু লজ্জা। এক একবার মুখ তোলে, চোখাচোখি হইলেই হাসিয়া ঘাড় নামায়। তারপর অনেক সাধ্য-সাধনায় এক এক-পা করিয়া পিঁড়ির উপর ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। সেই মুহূর্তেই আবার উঠিয়া দৌড়। দৌড়—দৌড়। মেয়ে আর ত্রিসীমানায় নাই। আর ছেলে-মানুষ শিবনাথও পাকা দাড়ি দোলাইয়া পিছন পিছন ছুটিলেন।

ধর্ ধর্—

লগ্ন দু'টা—একটা সন্ধ্যার পর, আর একটা মাঝ-রাত্রের দিকে।

সন্ধ্যার লগ্নেই শুভকার্য চুকিয়া যায়, সেইটা সকলের ইচ্ছা। বাড়িতে মানুষ-জন নাই। কুটুম্বের মধ্যে আসিয়াছে ঐ এক কাদম্বিনী, পাড়ার লোক ধরিয়া কাজকর্ম খাওয়ানো-দাওয়ানো সমস্ত করিতে হইতেছে, কাজেই সকাল সকাল হইয়া গেলে সবদিকে সুবিধা। বরপক্ষকে বার বার এই কথাটা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘোর হইয়া আসিতে মশালের বোঝা লইয়া কদমতলার ঘাটে জন কয়েক গিয়া দাঁড়াইল। একটু পরেই রায়গঞ্জের বাঁকের দিক দিয়া ঢোলের আওয়াজ। শিবনাথ কোমরে গামছা বাঁধিয়া কাজকর্মের তদারকে ব্যস্ত ছিলেন, দূরের সেই ঢোলের বাদ্যে তাঁহার বুকের মধ্যে গুর-গুর করিয়া উঠিল। এ পক্ষের ঢুলিরা সারা পাড়া মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে জল-সইয়া ঘুরিয়া এখন বসিয়া বসিয়া চিঁড়া ও নারিকেল-সন্দেশ চিবাইতেছিল। শিবনাথ তাহাদের উপর গিয়া রুখিয়া পড়িলেন, ওরে বেটারা হাত পা কোলে করে বসে রইলি—ওরা যে এসে পড়ল। জবাব দিবি নে? জিততে পারলে গামছা বকশিশ একখানা করে।

গুড়-গুড় গুড়-গুড়—বীরদর্পে ঢোলে কাঠি দিয়া দিতে এদিককার বাজনদারেরা উঠিয়া পড়িল। শিবনাথ আর সেখানে নাই। চরকির মতো এদিক-ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে কনের ঘরে গিয়া দাঁড়াইলেন। চন্দন-আঁকা মুখ, লাল চেলি-পরা, শুভ্র অঙ্গে সোনার গহনা ঝিকমিক করিতেছে। মুখখানা আদর করিয়া তুলিয়া ধরিতে ঝর-ঝর করিয়া শিবনাথের এক রাশ চোখের জল ঝরিয়া পড়িল। বলিলেন, ও দিদি, নতুন বর পেয়ে বুড়োকে মনে থাকবে তো?

গৌরীর বড় ইচ্ছা করিতে লাগিল, দাদুর চোখ দু'টা মুছাইয়া দেয় একবার। কিন্তু সাহস হইল না। সুধা, মিনু, কমলারা সব নানাদিকে

রহিয়াছে। যে শত্রুপুরীতে বাস, ফাঁক পাইলে কেউ আজ রেহাই দিবে না।

সদর-বাড়ীতে এদিকে তুমুল কাণ্ড। লোকে লোকারণ্য। ফটকের এ-ধারে রাস্তার দিকে মুখ করিয়া কন্যাপক্ষের ঢুলি ও কাঁসিদারেরা। ওদিককার ঢুলির দল তাদের সামনে মুখোমুখি যুদ্ধভঙ্গিতে আসিয়া দাঁড়াইল। তেজি ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকাইয়া সুপুষ্ট পেশীবহুল হাত ঝাঁকাইয়া তারা ঢোলে ঘা দিতেছে, মুখে বলিয়া সেই বোলগুলি অবিকল ঢোল ও কাঁসির মধ্য দিয়া আদায় করিতেছে। ভিড়ের মধ্যে হইতে বাহবা আসিতেছে। বরের ঢোলে হাঁকিল—

কোথায় কনে—কুলো ব্যাঙ্?

অমনি দুই ফেরতা দিয়া কন্যাপক্ষের জবাব—

ঘরের কনে দেবো ক্যান্? ঘরের কনে দেবো ক্যান্?

তির্য্যগ্‌গতিতে অমনি পাঁচ-সাত পা ছুটিয়া আসিয়া বরের ঢুলি কাঠি দিতে লাগিল—

না দিবি ত এলাম ক্যান? না দিবি ত ভাঙ্‌ব ঠ্যাং—ভাঙ্‌ব ঠ্যাং—

ভাঙ্‌ব ঠ্যাং

হঠাৎ ইহার মধ্যে শিবনাথের চিৎকারে রসভঙ্গ হইল।

বর কই?

বরের বাপ নাই, জ্ঞাতিসম্পর্কের এক কাকা বরকর্তা। আগাইয়া আসিয়া তিনি বলিলেন, এই এসে পড়ল বলে। পিছনের নৌকায় আসছে। বরযাত্রীরা প্রায় সব এসে গেছেন।

নিশিকান্ত মল্লিক মহাশয়ের উপর ভাঁড়ারের ভার। বর দেখিতে তিনিও আসিয়াছিলেন। বলিলেন, আচ্ছা কাণ্ড! বিয়ে যেন আপনাদের মশায়। গ্রামের মানুষ সব ভেঙে এসেছে—ছাদের উপর

ঐ ওরা সব কি রকম তাকিয়ে। বাজনা-টাজনাগুলো বর আসা পর্যন্ত সবুর করতে হয়।

বরকর্তা হাসিয়া উঠিয়া সগর্বে কহিলেন, এ হল বরযাত্রীর বাজনা। বর এলে কি আর এই হবে? ইংরেজি-বাজনা মশায়, ইংরেজি-বাজনা। জয়ঢাক রয়েছে, জিলিপি-বাঁশী—বরের নৌকায় আসছে সব। এ ঢোলের বাপ্পি-টাপ্পি উড়ে যাবে তার মধ্যে।

বরযাত্রীরা আসন গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ভিড় কমিল না। বর ঐ আসে, ঐ আসে। নিশ্বাস নিরুদ্ধ করিয়া সকলে ফটকের দিকে চাহিয়া আছে। ক্রমশ চারিদিকে কেমন ঝিমাইয়া পড়িতে লাগিল। প্রথম লগ্ন কাটিয়া গেল, ত্রিসীমানার মধ্যে ইংরেজি-বাজনার সাড়াশব্দ নাই।

গ্রামে মধু চক্রবর্তীর ঘোড়া আছে। ঘোড়ায় করিয়া তাঁকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, নদীর তীরে তীবে কুকশিমার ঘাট অবধি যাইবেন, যদি পথে বরের নৌকার দেখা পান।

ক্ষণপরে নিশিকান্ত বৈঠকখানায় আসিয়া বিনা ভূমিকায় বলিলেন, মশাইরা গাত্রোত্থান করুন।

বরকর্তা এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিলেন, অর্থাৎ?

হাসিয়া নিশিকান্ত বলিলেন, সে সব কিছু নয় মশায, কাজকর্ম এগিযে রাখছি। উঠে পড়ুন।

কিন্তু ওরা না এসে পড়লে—সে কি রকম হবে! হঠাৎ তিনি অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। আর ঐ যে কথায় কথায় ইংরেজি বলে, গোঁফ-কামানো, টেড়ি-কাটা ঐ গুলোকে আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি নে মশায়। ওরাই তো গোল বাধাল। বসে বসে চা গিলছে, আর বলল—আপনারা রওনা হন, আমরা ছোট নৌকোটায় চলে যাব, কতক্ষণ লাগবে? নবনীকে বললাম, তুই আয়। ও বলল, কলকাতার

বন্ধুদের ফেলে যাই কি করে? আমি ঠিক বলছাম, বেটারা কুকশিমার হাটে বসে খিঁচুড়ি-ভোজ লাগিয়েছে। আস্ত রাক্ষস এক একটা।

• •

বরযাত্রীদলের পরিতোষপূর্বক আহারে কোন বাধা ঘটিল না। তারপর একদল দু'দল করিয়া গ্রামের নিমন্ত্রিত মেয়ে-পুরুষদেরও হইয়া গেল। বরের খোঁজ নাই।

বিয়ে-বাড়ি তখন একেবারে নিস্তব্ধ। পাড়ার সকলে দুই-একে সরিয়া পড়িয়াছেন—আপাতত বাড়ি গিয়া একটু ঘুমাইয়া লওয়া যাক, ইংরেজি-বাজনা শুনিলেই তখন আসা যাইবে। বৈঠকখানার বড় আলো নেভানো, মিটিমিটি বাতি জ্বলিতেছে, ববযাত্রীদের নাসিকা-গর্জন ছাড়া কোন দিকে কোন ধ্বনি নাই। অন্দরের উঠানে সাজানো বিয়েব আসরের খানিক দূরে মেযের মা আবছা অন্ধকারে বসিয়া আছে। আর শিবনাথ একবার ঘব একবার বাহির, কেবলই ছুটাছুটি করিতেছেন।

শেষ-লগ্নও উত্তীর্ণ হইয়া যায, এমনি সমযে খটখট করিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া মধু চক্রবর্তী আসিয়া নামিলেন। ঘটক ত্রিলোক-তাবণ তাঁব পিছন হইতে ভিজা কাপড়ে লাফাইয়া পডিয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শিবনাথ ছুটিয়া আসিলেন, কাদম্বিনী আসিলেন, ওদিকে কোথায় ঝিনমিন গহনা বাজিয়া উঠিল।

কি? কি? কি?

নৌকোডুবি।

চোখ মুছিতে মুছিতে বৈঠকখানা হইতে বরের কাকা ছুটিয়া আসিলেন।

সে কি সর্বনাশ। ঝড় নেই, ছাপটা নেই—

ঘটক বলিল, ভরতের দেউলের ঐ খানটায় এসে বাবুরা সব একদিকে ঝুঁকে পড়লেন। কোটালের গাঙ, টানের মুখ—

কাঁপিতে কাঁপিতে শিবনাথ বলিলেন, নবনীধন?

ঘটক দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িয়াছে।

আর্ত আকুল চিৎকার করিয়া শিবনাথ কহিতে লাগিলেন, বর কোথায়? বল শিগগির—বল—বল—

তারপর বজ্রাহতের মতো তিনিও সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল।

কাদম্বিনী আসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, বসে থাকলে তো হবে না, দাদা। কপালের ভোগ। ওঠ।

শিবনাথ ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া ছিলেন। তারপর উঠিয়া সদর-বাড়ির দিকে চলিলেন। সেখানে অপরিসীম নিঃশব্দতা। আবছা অন্ধকারের মধ্যে প্রকাণ্ড উঠানটির ভয়াবহ শূন্যতা যেন প্রেতপুরীর মতো লাগিতেছে। বৈঠকখানার বাতি জ্বলিতে জ্বলিতে একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়াছে, দপ করিয়া তাহাও একসময় নিভিয়া গেল। শিবনাথ বসিয়া রহিলেন। এমনি সময়ে ছায়ামূর্তির মতো মেয়ের মার হাত ধরিয়া কাদম্বিনী আসিয়া দাঁড়াইলেন। পুত্রবধূ কাঁদিয়া শ্বশুরেব পায়ের উপর পড়িল।

ও বাবা, না খেয়ে না দেয়ে সাতরাজ্যি ঘুরে খুকীর আমার সোনার বর এনেছিলে—কোথায় গেল সে? ধরে নিয়ে এস।

পলকহীন চোখ মেলা ছিল, এইবার শিবনাথ চোখ বুঁজিলেন। চোখের কোণ দিয়া দরদর ধারে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

চুপ কর বউমা, চুপ কর। কাদম্বিনী আঁচল দিয়া নিজের চোখ

মুছিলেন তারপর বলিলেন, আভ্যুদিক হয়ে গেছে, ও মেয়ে তো ঘরে রাখা যাবে না দাদা। ওঠ—

মেয়ের মা আগুন হইয়া উঠিল।

কে তাড়ায় আমার মেয়ে? আমি ঐ সঙ্গে বিদায় হব তা হলে।

কাদম্বিনী বলিলেন, অবুঝ হোস নে বউমা, রাত পোহালে মেয়ে যে বিধবা হয়ে যাবে। তার চেয়ে রাতের মধ্যে একজনকে এনে—

ভগ্নকণ্ঠে শিবনাথ বলিলেন, কাকে পাব? সোনার প্রতিমা কার হাতে দেব? বলিয়া মাথায় হাত দিলেন।

কিছু না হলে তো হবে না—ওঠ। হঠাৎ কাদম্বিনীর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, ঐ নিশি মল্লিক। বউ মরবার পর দিনকতক উসখুস করেছিল না? কাকে দিয়ে যেন একবার খবর পাঠিয়েছিল, শুনেছিলাম।

অমন কাজ করো না পিসিমা, মেয়ে আমার আত্মহত্যা করবে। মেয়ের মা আবার কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল। বলিল, আমি যেমন ওকে জানি, কেউ তোমরা জান না। ও আমার বড্ড অভিমানী।

কাদম্বিনী বলিলেন, বউমা, অবুঝ হোস নে। আর তো উপায় নেই। রাত শেষ হয়ে এল। তুমি এস দাদা—

নিশিকান্ত মল্লিকের কর্তব্যজ্ঞান খুব প্রখর বলিতে হইবে। বিয়েবাড়ি বাহিরের একটা মানুষও নাই। কেবলমাত্র তিনি যথারীতি ভাঁড়ার আগলাইয়া বসিয়া আছেন। শিবনাথকে লইয়া একরকম টানিতে টানিতে কাদম্বিনী সেখানে উপস্থিত হইলেন।

প্রস্তাব শুনিয়া মল্লিক তো আকাশ হইতে পড়িলেন। সে কি!

ইহা যে স্বপ্নেও ভাবিতে পারা যায় না। ঘর খালি করিয়া তিন তিন দফা ঘরের লক্ষ্মী বিদায় লইয়াছে, বুকের মধ্যে তাঁর যা হইয়া থাকে সে কথা আর বলিয়া কাজ কি! আবার সেখানে কোন মুখে আর এক-জনকে লইয়া বসানো যায়? ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ়কণ্ঠে নিশিকান্ত বলিলেন, না। ও হবার জো নেই।

কাদম্বিনী বলিলেন, 'না' বললে হবে না মল্লিক মশায়। ও যে বিধি-লিপি। গৌরী তোমার হাঁড়িতে চাল দিয়ে এসেছিল—বিয়ে কি আর কোথাও হবার জো আছে। রাত শেষ হয়ে এল। ওঠ—

অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর নিশিকান্ত নরম হইলেন। শিবনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কিন্তু সোনা-রূপো-নগদ টাকা—সমস্ত দেওয়া হচ্ছিল তার এক পাই এদিক-ওদিক হলে চলবে না। কত ঝক্কি পোহাতে হবে—কত লোকে কত কি বলবে—বাড়িতে এক পাল ছেলেপুলে রয়েছে—বুঝে দেখুন ব্যাপারটা।

চুক্তি সমাধা হইয়া গেলে ধাঁ করিয়া নিশিকান্ত কোমরের গামছা খুলিয়া হাত পা ধুইয়া পিঠের উপর কোঁচার খুঁট তুলিয়া সভ্য-ভব্য হইয়া বরাসনে বসিলেন। বলিলেন, বাড়িতে খবর দিয়ে কাজ নেই। পঙ্গপালগুলো এসে জুটবে, বাধা পড়ে যাবে। আমার তো ইচ্ছে ছিল না। কি করি—তোমাদের এই মহাবিপদ।

পুরুত ঠাকুর চলে গেছেন, তাঁকে যে ডাকতে হবে।

শিবনাথ হতভম্বের মতো বসিয়া ছিলেন, তাঁহার গায়ে নাড়া দিয়া কাদম্বিনী বলিলেন, যাও না একবার—ও দাদা, ঠাকুর মশায়কে আর পাড়ার ওদের সব ডেকে নিয়ে এস।

নিশিকান্ত বাধা দিয়া উঠিলেন, না, না—তা-ও কাজ নেই। ওঁকে যেতে হবে না। আমি যাচ্ছি।

উদ্যোগী পুরুষ। হারিকেন জ্বালিয়া নিজেই পুরোহিত ডাকিতে বাহির হইলেন।

ঢুলিরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদেরও আর ডাকা হইল না। রাত্রি শেষ প্রহর। নিঃশব্দে বিবাহের আয়োজন হইল।

গৌরী! গৌরী!

গৌরী ঘুমায় নাই, জানালায় বসিয়া বাহিরের অন্ধকারে তাকাইয়া ছিল। ঝুন-ঝুন করিয়া সে উঠিল। শিবনাথ সজল কণ্ঠে বলিলেন, চলে আয় দিদি, সম্প্রদান হবে।

ধীরে ধীরে মেয়ে পিঁড়ির উপর বসিল।

ফিস-ফিস করিয়া কাদম্বিনী বলিলেন, দেখলে বউমা? তুমি যে কত ভয় করেছিলে, মেয়ে আত্মহত্যা করবে—হেন করবে, তেন করবে। সত্যি, বড্ড শান্ত মেয়ে।

নিঃশব্দ অন্ধকারাচ্ছন্ন অতি বৃহৎ সেকেলে বাড়ি। দু'টি মাত্র লণ্ঠনের স্তিমিত আলো। মাথার উপরে নির্নিমেষ নক্ষত্রমণ্ডলী। হঠাৎ আলোর শিখা কাঁপাইয়া হু-হু শব্দে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া বহিয়া গেল। পুরোহিতের দেহের প্রতি শিরায় কম্পন বহিল। বলিলেন, নাও, হয়ে গেল এবার। বর-কনে ঘরে তোল। এ কি রকম কাণ্ড—এমন তো দেখিনি কখনো। একটা উলু পর্যন্ত দিতে পারলে না কেউ—

কাদম্বিনী বলিলেন, ও বউমা, দাও না গো। আমি বিধবা মানুষ—আমার যে দিতে নেই।

শুভ-বিবাহে উলু দেওয়া বিধি, এবং বিবাহক্ষেত্রে সধবা বলিতে ঐ এক মেয়ের মা। দু-তিন বার সে চেষ্টা করিল, কিন্তু গলা যেন কাঠ হইয়া গিয়াছে। স্বর না ফুটিয়া চোখের জলে কাপড় ভিজিয়া যায়।

শিবনাথ নিস্তব্ধ পাথরের মত বসিয়াছিলেন—হঠাৎ মহা চেঁচামেচি শুরু করিলেন, কে—আছিস শাখ নিয়ে আয়। বাজনদার বেটারা বাজা এইবার। দিদি আমার বিদেয় হয়ে গেল। ওগো বউমা, তুমি একটু উলু দাও—

পুরোহিত বলিলেন, উলু দাও শাঁখ বাজাও—মেয়ে-জামাই ঘরে তোল।

তবু চুপচাপ। হঠাৎ ইহার মধ্যে কি হইয়া গেল। সেই বিয়ের কনে—চন্দন ও অলঙ্কারে ভূষিতা চিরদিনকার সেই শান্ত লাজুক মেয়েটি অকস্মাৎ গুণ-ছেঁড়া ধনুকের মতো পিঁড়ির উপর খাড়া হইয়া দাঁড়াইল, এক ঝটকায় চেলির ঘোমটা টানিয়া দূর করিয়া দিল। বিদ্যুল্লতার মতো মুখখানি জ্বলিতেছে। ঊষাকালের শান্ত নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া বিমথিত করিয়া আরম্ভ করিল, উলু—উলু—উলু—

ধর্ ধর্! ধরে বসা। তেল জল নিয়ে আয়, বাতাস কর্। শিবনাথ আর্তনাদ করিয়া আসিয়া গৌরীকে ধরিলেন। পুরোহিত, কাদম্বিনী সকলেই ধরিলেন। ধরিয়া বসায় কাহার সাধ্য—মেয়ের গায়ে যেন অসুরের বল। কোন দিকে তার দৃষ্টি নাই, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারিদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই ভাঙাবাড়ির প্রত্যেকটি অলিন্দ কাঁপাইয়া ক্রমাগত সে উলু দিতেছে, উলু—উলু—উলু—

ও গৌরী, মাগো আমার—

মা পাগলের মতো দুই হাতে সকলকে ঠেলিয়া সরাইয়া একেবারে মেয়ের মুখের কাছে মুখ লইয়া আসিল। বলিতে লাগিল, ওরে, তোমরা ধরে-বেঁধে আমার মাকে খুন করলে। আয় মা, তুই আর আমি চলে যাই—

ধপাস করিয়া গৌরী সংজ্ঞাহারার মতো আবার পিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল।

এত গোলমালের মধ্যেও বর কিন্তু অবিচল। আসন হইতে তিনি নড়েন নাই, এবং ইহাদের কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। এইবার বিজয়ীর মতো মুখ করিয়া কাদম্বিনীকে কহিলেন, দেখলে তো দিদিমা, ঠাণ্ডা হয়ে বসল কিনা! অনেক দেখা আছে, তোমার এ নাতজামাই তো আজকের লোক নয়—

সে বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিল না, কাদম্বিনীরও নয়। নিশি মল্লিক বলিতে লাগিলেন, এই কাজ করে চুল পাকিয়ে ফেললাম, জানতে কিছু বাকি আছে? সমস্তদিন খায় নি তার উপর এই রকম একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল। ও অমন হয়েই থাকে। আর এই নিয়ে আপনারা কি সব আরম্ভ করে দিলেন বলুন তো।

মেয়ে তখন দিব্য জড়সড় হইয়া বসিয়াছে, ঠিক আগেকার মতো। এই মেয়েই যে একটু আগে এমন করিয়া উঠিয়াছিল, ভাব দেখিয়া তিলমাত্র বুঝিবার জো নাই। ফুটফুটে সকাল হইয়া গিয়াছে। সকলে লজ্জিত হইয়া পড়িল।

পুরুত বলিলেন, এক পাক বাসরটা বেড়িয়ে এস হে মল্লিক, রীতি রক্ষে করতে হয়।

অনেক পাকই হয়ে গেছে ঠাকুর মশায়, এখন অনেক কাজ—হেঁ হেঁ—

মল্লিক দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া হাসিতে হাসিতে গাঁটছড়া খুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শিবনাথের উদ্দেশে বলিলেন, একা মানুষ- জানেন তো দাদা মশায়। কিছু মনে করবেন না। এখনই বাড়ি গিয়ে বউ তোলবার ব্যবস্থা করতে হবে।

দীর্ঘপদক্ষেপে নিশিকান্ত অদৃশ্য হইলেন। এবং বিকালে পালকি লইয়া আসিয়া বধূ বরশয্যা গহনা ও টাকাকড়ি দেখিয়া শুনিয়া হিসাবপত্র করিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

কাদম্বিনীও সেই দিন চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর চাকরটা কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে, ঝি, নিচে শুইয়া। এ-ঘরে বুড়া দাদু আর ও-ঘরে মা আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

অনেক রাত্রে খোলা-জানলার সামনে দেবদারু-ফল খাইতে বাদুড়ে ঝাটাপটি লাগাইল। মার ভয় ভয় করিতে লাগিল। উঠিয়া গিয়া খট করিয়া জানলা বন্ধ করিয়া দিল।

ও-ঘর হইতে শ্বশুর প্রশ্ন করিলেন, বউমা জেগে আছ?

ঘুম আসছে না।

আমারও না। এস তাস খেলি।

আলো লইয়া শ্বশুরের শয্যার একান্তে বধূ তাস লইয়া বসিল তাস হাতে ধরিয়াই শিবনাথ ঝিমাইতে লাগিলেন।

বধূ বলিল, বাবা টেক্কা ঘুস দিলে যে!

ঈস, বড্ড ভুল হয়ে গেছে তো। চোখ মেলিয়া তাড়াতাড়ি বুড়া খাড়া হইয়া বসিলেন। হাত দুই খেলিয় বলিয়া উঠিলেন, দুত্তোর, একি হয়? আমি বাপু, খেলা দেখতে পারি তাই আমার অভ্যাস।

ইঁহাদের অভ্যাস এই, অনেক রাত্রি অবধি মা ও গৌরী তাস খেলিত। শিবনাথ বধূর দিকে জুত দিবার নাম করিয়া বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেন। গৌরী বলিত, ও দাদু, শুয়ে পড় না—

অর্ধমুদ্রিত চোখ বড় বড় করিয়া মেলিয়া হাসিয়া শিবনাথ বলিতেন, তোর ঘাড়ে পঞ্জা-ছক্কা না দিয়ে? ও বউমা, বসে বসে করছ কি?

গভীর রাত্রে গৌরী ঘুমাইয়া পড়িত, প্রকাণ্ড খাটের আর একধারে

শিবনাথ ঘুমাইতেন। মা উঠিয়া আলো নিভাইয়া অন্য ঘরে চলিয়া যাইত।

শিবনাথ বলিতে লাগিলেন, গরবী দিদি এমন আড্ডাটা ভেঙে দিয়ে গেল—আমার বড্ড রাগ হচ্ছে আসুক সে একবার। আচ্ছা সে এখন কি করছে—বল দিকি বউমা।

ঘুমুচ্ছে আর কি। কাল সারারাত তো দু-পাতা এক করে নি।

শিবনাথ যেন কতকটা সান্ত্বনার ভাবে কহিতে লাগিলেন, এক হিসেবে বর নিতান্ত মন্দ হয় নি। বাড়ি ঘর, চাকর-চাকরানি, এলাক-পোষাক কোন কিছুর অভাব নেই। এক বয়সের দিক দিয়ে একটু—তা এর চেয়েও ঢের ঢের বেশি বয়সে মানুষে বিয়ে করছে

বধূ কিন্তু সায় দিতে পারিল না, চুপচাপ রহিল শিবনাথ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, কিছু বলছ না যে বউমা?

মৃদু স্বরে বধূ কহিল, কি আর হবে?

শিবনাথ কাথয়া উঠিলেন। কি হবে, মানে? ভেবে দেক দিকি, মন্দটা কি। আমি তো বলি, ও নবনীদনের চেয়ে ভালই হয়েছে। গরবী দিদিও মনে মনে বুঝে দেখেছে তাই ভারি চালাক মেয়ে। আজকে কেমন ঠাণ্ডা হয়ে পালকিতে উঠে বসল। আমি ভেবেছিলাম কত কাঁদাকাটা করবে। একবার টু শব্দটা করল না।

এক পক্ষেরই কথা চলিতেছে, বধূ নিরুত্তর।

নিশ্বাস ফেলিয়া শিবনাথ বলিতে লাগিলেন, যা ভয় হয়েছিল আমার। তুমি দেখো বউমা নিশি আমার দিদিকে কি রকম যত্ন করবে। তিন তিন'ট বউ গিয়েছে, এবারে রাঙা বউ পেয়ে ধিন-ধিন করে কাঁধে তুলে নাচাবে। তুমি দেখো।

বলিয়া নিজের রসিকতায় হা হা করিয়া নিজেই হাসিয়া আকুল।

বধূ ধীরে ধীরে উঠিয়া দোর ভেজাইয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

আরো কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। আলো নিভিয়া ঘর অন্ধকার। ডাকাডাকিতে শিবনাথের ঘুম ভাঙিয়া গেল। বধূ পা ধরিয়া নাড়াইতেছে, আর ডাকিতেছে, বাবা, বাবা।

শিবনাথ তাড়াতাড়ি লাফাইয়া উঠিলেন।

শুনতে পাচ্ছ ?

কি ?

হাত ধরিয়া এক রকম টানিয়া শ্বশুরকে বধূ নিজের ঘরে জানলার দেবদারুগাছেব কাছে লইয়া আসিল।

শুনতে পাচ্ছ না, ঐ কে যেন উলু দিচ্ছে ?

শিবনাথ বলিলেন, না তো—

শোন। মা আমার এসেছে—ঢুকতে পারছে না, বাইরে বাড়ির ফটকের ঐখানে উলু দিচ্ছে। ভাল করে কান পেতে শোন দিকি—

এমনি সময়ে আবার একঝাঁক উলু উঠিল। অনেক দূরের অস্পষ্ট ধ্বনি রাত্রির বুক কাটিয়া কাটিয়া আসিতেছে–

উলু উলু—উলু।

যাচ্ছি দিদি। উন্মাদের মতো আকাশ-ফাটানো কণ্ঠে শিবনাথ চিৎকার করিয়া উঠিলেন। এক লাফে দুই-তিন ধাপ করিয়া সিঁড়ি ভাঙিয়া অন্ধকারের মধ্যে প্রকাণ্ড দু'টি মহল পার হইয়া ছুটিয়া চলিলেন। পিছনে পিছনে মা-ও ছুটিল। ফটক খুলিয়া অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে দেখা গেল, গৌরী। একটা গাছের উপর অজস্র জোনাকি পড়িয়া ঝকমক করিতেছে, তাহারই তলায় ছোট ছোট অজস্র ঝুপসি গাছ।

তার মাঝখানে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া গৌরী ক্রমাগত উলু দিয়া যাইতেছে, উলু—উলু—উলু—

সকাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিশিকান্ত মল্লিকও উপস্থিত। বলিলেন, দিনমানে খাসা ভাল মানুষ—কোন গোলমাল নেই। সন্ধ্যের থেকেই ক্ষেপে উঠল। উলু দেয় আর ছুটে ছুটে বেড়ায়। কালরাত্রি বলে আমার আবার সামনে যাবার জো ছিল না। মেজ খোকা, খুদি আর চারুকে বলে দিলাম। তা ওদের কাজ? জোরজার করে ধরে শুইয়ে দিয়েছিল। কখন পালিয়ে এসেছে। সকালবেলা উঠে—খোঁজ- খোঁজ—

একটু পরেই পালকি-বেহারা চলিয়া আসিল।

শিবনাথ মিনতি করিয়া বলিলেন, আমাদের এখানে ক'দিন রেখে যাও দাদা। আমরা সুস্থ করে তারপর পাঠিয়ে দেব।

হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া নিশিকান্ত বলিলেন, মিছে ব্যস্ত হচ্ছেন। আজকে ফুলশয্যে, তারপর বউভাত। জ্ঞাতির পাতে দুটো ভাত দেব, মনন করেছি। বিয়ে তো ঐ রকমে হল, এর পরে একেবারে কিছু না করলে লোকে যে গায়ে থুথু দেবে।

শিবনাথ বলিলেন, নিতান্ত আজকের দিনটে থাকুক। ওর মনটা একটু ভাল হয়ে যাক। নাতজামায়ের হাত দু-খানা ধরিয়া বলিতে লাগিলেন আমার তো সেই থেকে গা কাঁপছে দাদা। সমস্ত রাত ও ঘুমোয় নি, কেউই ঘুমোই নি। এখন একটু ঘুমোচ্ছে। আজকে থাক, কাল নিয়ে যেও।

মল্লিক মুখ কালো করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইলেন। বলিলেন, তাই আমি সেদিন কিছুতে রাজি হচ্ছিলাম না। চুণ-কালি আমার

মুখে ভাল করে পড়ুক গিয়ে। আজকে ফুলশয্যে, নেমন্তন্ন-আমন্তন্ন হয়ে গেছে—আত্মীয়-কুটুম্ব এসেছে—

বিরস মুখে শিবনাথ কহিলেন, তবে নিয়ে যাও।

ঘুম হইতে মেয়েকে ডাকিয়া তোলা হইল। সকলকে প্রণাম করিয়া শান্তভাবে গৌরী পালকিতে গিয়া বসিল। নিশিকান্ত ভরসা দিয়া বলিলেন কিচ্ছু ভাবনা করবেন না দাদা মশাই। আপনারা জানেন না তাই, আমার বিস্তর দেখা আছে। কাল তো আমি দেখাশুনো করতে পারি নি- এখন থেকে নিজে দেখব, যত্ন-আত্তি করব, দরকার হয় ডাক্তার দেখাব। ভয় কি? শাশুড়ি ঠাকরুনকে বুঝিয়ে দেবেন।

কিন্তু চেষ্টা যত্ন এবং নিশিকান্তের নিজের দেখা সত্ত্বেও ঠিক আগের রাত্রির মতো উলু পড়িতে লাগিল। এবং এদিন একেবারে অন্দরের উঠানের উপর সেই দেবদারুগাছটির গোড়ায়। গলায় ফুলের মালা, সর্বাঙ্গে ফুলের অলঙ্কার, মূল্যবান কাপড়-চোপড়ে এসেন্সের সুগন্ধ। বাতাস সেই গন্ধে সুরভিত হইয়াছে, ফুলের শয্যা হইতে পলাইয়া রাজরাজেশ্বরী দেবদারুর ডাল ধরিয়া কলকণ্ঠে যেন ঘুমন্ত নিশীথিনীর কানে উলুধ্বনি করিতেছে। উলু—উলু—উলু—

গৌরী, গৌরী।

যেন তার সম্বিৎ নাই যেন সে আর কোন জগতে চলিয়া গিয়াছে। ধরিয়া আনিয়া গৌরীকে শোয়ান হইল। তারপর আর কোন গোল নাই, চুপ করিয়া সে ঘুমাইতে লাগিল।

শিবনাথ চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, উঠোনে এল কি করে বউমা?

বধূ বলিল, ফটক আমি খুলে রেখেছিলাম।

তুমি কি জানতে?

আমার মন ডেকে বলেছিল। ভাবলাম, যদি আসে, সে কি আমার পথে দাঁড়িয়ে থাকবে?

পরদিন পালকি-বেহারা সহ নিশিকান্ত যথারীতি দর্শন দিলেন। মুখখানা হাঁড়ির মতো। বলিলেন, এই করে নিত্যি আমার পালকি-ভাড়া লাগছে পাঁচ সিকে প্রতিবিধান করা আবশ্যক হয়ে উঠেছে, রাতবিরেতে বউ ঝি এই একমাইল পথ পায়ে হেঁটে আসবে—এই বা কি রকম।

শিবনাথ বলিলেন, ও তো সহজ বুদ্ধিতে আসে না। দিদি আমার তেমন মেয়ে নয়।

নাত-জামাই গর্জাইতে লাগিলেন, না, বজ্জাতের হাঁড়ি। আমি জেগে আছি। বলে, বাইরে থেকে আসছি। তারপর চোঁ-চা ছুট। আমি আর রাগ করে এলাম না। এ রকম ব্যাধি তো কোন পুরুষে শুনি নি। সমস্ত ঢং মশায়, বাপের বাড়ি আসবার ছুতো। কিন্তু যাবে কোথায়, আমিও তিন তিনটে বউ সায়েস্তা করেছি।

এই বিষয়ে এককালে মল্লিক মশায়ের সুনাম রটিয়াছিল বটে, সেই কথা স্মরণ করিয়া মেয়ের মা ও শিবনাথ দু-জনেই শিহরিয়া উঠিলেন।

এতদিন পরে মা আজ জামায়ের সঙ্গে প্রথম কথা কহিল। না বাবা, ছুতো ধরবার মেয়ে ও নয়।

স্বর কাঁপিতে লাগিল, কথা আর ফুটিতে চায় না। তবু বলিতে লাগিল, সমস্ত সেরে যাবে বাবা, তুমি একটু দৃষ্টিমুখ দিয়ো। গৌরী আমার বড় শান্ত মেয়ে।

পরম কৃতার্থ হইয়া জামাতা পায়ের ধুলা লইলেন। একমুখ হাসিয়া

বলিতে লাগিলেন, নিশ্চয় নিশ্চয়। মন্তোর পড়ে বিয়ে করেছি—চালাকি কথা নয়। যা করতে হয়, আমি করব। কিছু ভেব না মা, মেয়ে তোমার ঠিক হয়ে যাবে। দুটো দিন সবুর কর।

ভক্তিমান জামাই পুনশ্চ শাশুড়ি ও দাদাশ্বশুরের পায়ের ধুলা লইয়া বিদায় হইল।

শিবনাথ বলিলেন, আজকেও কি ফটক খুলে রাখবে বউমা?

বধূ জবাব দিল না, কিন্তু ফটক সে খুলিয়া রাখিল। গভীর রাত্রি পর্যন্ত সে জানলায় দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর সপ্তর্ষিমণ্ডল পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল, শেষ-রাতের চাঁদের আলো তেরছা হইয়া ঘরের মধ্যে লুটাইয়া পড়িল, শিয়ালের দল শেষ ডাক ডাকিয়া চুপ করিল, তখন শিবনাথকে ডাকিয়া বলিল, বাবা, উলু কিছু শুনতে পাও?

কান পাতিয়া দু-জনে আরও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। জগতের ক্ষীণতম স্পন্দনটুকুও বুঝি থামিয়া গিয়াছে এমনি গভীর নিদারুণ স্তব্ধতা। সেই স্তব্ধতা ভাঙিয়া হাসিয়া শিবনাথ বলিলেন, গরবী দিদি এতক্ষণ বরের কাছে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। চল চল বউমা, আর কোন ভয় নেই—

•

দিন সাত-আট কাটিয়া গেল, সত্যই কোন গোল নাই। নিশিকান্ত বহুদর্শী লোক—বাগ মানাইবার ক্ষমতা আছে, স্বীকার করিতে হয়। ইতিমধ্যে ঝি গিয়া দিন তিনেক খবর আনিয়াছে। প্রথম দিন গৌরীর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, দিব্য সে হাসিব কথাবার্তা কহিয়াছিল, চুপি চুপি বলিয়াছিল, দাদুকে বলিস নিয়ে যেতে। কিন্তু তা হইবার জো নাই, বউভাত হয় নাই। এবং কবে যে সে শুভক্ষণ আসিবে, তাহাও নিশিকান্ত ঠিক করিয়া বলেন না। তারপর আরও দু-দিন গিয়াছে, কিন্তু

জামাই দেখা হইতে দেন নাই। শেষের দিন চটিয়াই আগুন। বলিয়া দিলেন, নিত্যি নিত্যি তোমরা শত্রুতা সাধতে কেন এস, বল দিকি?

ঝি অবাক।

জামাতা বলিতে লাগিলেন, বাপের বাড়ির কুটোগাছটা দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়, আর তুমি তা আস্ত মানুষ একটা। ওষুধ-পত্তর হচ্ছে—নিজেরা রাত-দিন লেগে পড়ে আছি, প্রায় ঠিক হয়ে এসেছে, তোমরাই এসে গোল বাধাও। কিন্তু আর বিশেষ গোলমাল নেই—ওঁদের গিয়ে বোলো।

খবর শুনিয়া শিবনাথ নিশ্চিন্তে নিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, ও বউমা, মিছিমিছি আর ফটক খুলে রাখ কেন? আঁব-দুধ মিশে গেছে—আঁটি এখন তল। শুনলে? নাত-জামায়ের আমার চেষ্টার কসুর নেই। আহা-হা, চিরজন্ম বেঁচে থাক। কিন্তু শালীর আক্কেলটা দেখ, নতুন বর পেয়ে বুড়োটাকে একদম ভুলে গেল। না আসতে পারিস, এক-আধ ছত্র চিঠি লিখেও তো খোঁজ নেওয়া যায়।

মনের আনন্দে হাসিয়া বুড়া ছাদ ফাটাইতে লাগিলেন।

•

পরের দিন সকালবেলা শিবনাথ উঠিয়া খাটের উপর বসিয়াই গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন। বধূ আসিয়া অস্বাভাবিক উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, বাবা, গৌরী এসেছে।

এসেছে? গুড়গুড়ি ফেলিয়া শিবনাথ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অ বউমা, পালকি করে এসেছে তো? নইলে নাতজামাই রেগে যাবে।

দেখসে এসে। বলিয়া উন্মাদিনীর মতো বধূ শ্বশুরের হাত ধরিয়া

লইয়া চলিল। নিচে গিয়া চেঁচাইতে লাগিল, ওরে, কে কোথায় আছিস –ছুটে আয়। মা আমার ফিরে এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে।

ঝি ও চাকর ছুটিয়া আসিল। রাস্তার উপর তখন ভিড় জমিয়া গিয়াছে। টিকের গা ঘেষিয়া ফুটন্ত চাঁপার গুচ্ছের মতো গৌরী এলাইয়া পড়িয়া আছে ছিন্ন বেশ, রুক্ষ আলু-থালু চুল, পিঠের ও হাতের কাপড় সরিয়া গিয়াছে, তাহার আগাগোড়া ব্যাপিয়া বড় বড় রক্তের রেখা। সোনার অঙ্গে আপন হাতে নাশিকান্ত বেত মারিয়াছে, চামড়া কাটিয়া গিয়াছে চাপ চাপ রক্ত জমিয়াছে।

রাস্তার লোক একজন মন্তব্য করিল, পশু।

মা কাণ্ডজ্ঞান ভুলিয়া সেইখানে—রাস্তার উপর আছড়াইয়া পড়িল।

মা আমার, আজ কি গয়না পরে এল? · ও বাবা, তুমি আমায় ফটক খুলতে মানা করলে মা আমার সমস্ত রাত এইখানে রয়েছে। কত ডেকেছে, কালঘুম ঘুমিয়ে ছিলাম।

অজ্ঞান অবস্থায় গাড়ির মধ্যে ধরাধরি করিয়া আনা হইল। ডাক্তার আসিল নাশি মল্লিকের কাছে খবর গেল, রাগ করিয়া তিনি আসিলেন না। বেলা প্রহর দেড়েকের সময় রোগিনীর জ্ঞান ফিরিল। জ্বর খুব বেশি, চোখ দুটি জবা ফুলের মত লাল চোখ মেলিয়াই সে লাফাইয়া উঠিতে যায়। তারপর প্রলয়ের কণ্ঠে

উলু উলু উলু।

বিকালের দিকে গৌরী ঘুমাইল। ডাক্তার বলিলেন, বিকারে দাঁড়িয়েছে মনে হয়। ওষুধে কাজ হয়েছে। একটু কমেছে। আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু খুব সাবধান।

এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা কাটিয়া গেল, গৌরী শান্ত চোখ দু'টি বুজিয়া

তেমনি ঘুমাইতেছে। মা ভয়ে ভয়ে একবার নাকের কাছে নিশ্বাসের স্পর্শ লন। তারপর একবার বালি তৈয়ারির জন্য রান্নাঘরে গেলেন। কেহ নাই। হঠাৎ, উলু—উলু—উলু—

বিছানা ছাড়িয়া গৌরী উঠিয়াছে। রুক্ষ এলায়িত চুলের বোঝা। কবে কখন সিন্দুর পরিয়াছিল, তাহার রেখাটি কপালের উপর জলজল করিতেছে। বক্ষের রেখা নিটোল শুভ্র অঙ্গে চিত্র-বিচিত্র ডোরা কাটিয়া গিয়াছে। অসম্বৃত বেশ-ভূষা। নিচের তলায় নামিয়া আসিয়া পুরানো বাড়ির কক্ষে কক্ষে ঝঙ্কার তুলিতেছে—উলু-উলু-উলু।

ধর্ ধর্—

কে তার সঙ্গে ছুটিয়া পারিবে? ধরিতে গেলে সেই অপরূপ রূপে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া সে ছুটিয়া পলায়। বেলাশেষে সূর্য আকাশপ্রান্তে নামিয়া আসিয়াছে, বেড়ার ধারে সন্ধ্যামণি ফুটিয়া উঠিল, হাওয়ায় ঝুর-ঝুর করিয়া দেবদারু-পাতা ঝরিতে লাগিল। তাহারই মধ্যে মহাপ্রলয়ের অগ্নিশিখার মতো নাচিয়া নাচিয়া সে উঠানময় ঘুরিতে লাগিল। যেখানে সামিয়ানার নিচে বিয়ের বাসর রচিত হইয়াছিল, পায়ের আঘাতে সেই শুকনা শতচ্ছিন্ন ফুল উড়াইতে লাগিল।

আকাশ-বাতাস মথিত করিয়া, বাড়ির প্রতি কক্ষ, অলিন্দ, প্রত্যেকখানি ইট স্পন্দিত করিয়া অশ্রান্ত কণ্ঠের অবিরাম তরঙ্গ উঠিতে লাগিল উলু-উলু-উলু—

বেলা ডুবিবার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী চোখ বুঁজিল।

কার্তিকের মতো ছেলে, দিব্য ফুটফুটে গোলগাল চেহারা। কিন্তু এমন ছেলে বোধকরি বা বোবা হইয়া যায়! তিন বছর পার হইয়া গেল, একটি মাত্র বুলি ফুটিয়াছে—মা। কারণে-অকারণে ঐ মা—মা—করিয়া খোকা হাসিয়া ওঠে।

একদিন চারুবালা ধরিয়া বসিল, চল, পায়রার ঠাকুরকে দেখিয়ে আসি একবার—

ম্লান হাসিয়া সিদ্ধেশ্বর কহিল, কতই তো হল, আর কেন?

পায়রার কালীবাড়িতে সম্প্রতি এক মহাসিদ্ধপুরুষ অধিষ্ঠান করিয়াছেন। তাঁর অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের বৃত্তান্ত একটা গোটা জেলা পার হইয়া এতদূর অবধি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সন্ন্যাসী ঠাকুরের বয়স হাজার খানেক বছরের কম হইবে না। বামাচারী তন্ত্রসিদ্ধ যোগী। সমস্ত দিন বজ্রাসনে বসিয়া থাকেন। কাহারও সঙ্গে কথা বলেন না, কোন সেবা গ্রহণ করেন না। শোনা যায়, নিশীথরাত্রে শবসাধন করিয়া চণ্ডিকার নামে যে কারণ-বারি উৎসর্গ করেন, তাহাই তাঁহার একমাত্র পানীয়।

সিদ্ধেশ্বর বুঝাইতে লাগিল, কেন শোন ওসব—সমস্ত বুজরুকি। তুমিও যেমন! আর যাওয়া বললেই যাওয়া যায় অমনি? ছোট ছেলে নিয়ে কোথায় উঠব, কি করব—

কেন, তোমার মামার বাড়ি? বলিয়া স্বামীর দিকে তাকাইয়া চারু টিপি-টিপি হাসিতে লাগিল।

সিদ্ধেশ্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, বাড়ি-টাড়ি গেছে কবে—সে কি আজকের কথা? ভিটেটা যদি থাকে। তা-ও হয়তো বিশ্বেসরা দখল করে নিয়েছে।

তবে আমার সতীনের বাড়ি গিয়ে উঠব। যত সব বাজে ওজর শুনব না আমি।

সিদ্ধেশ্বর তাড়া দিয়া উঠিল, চুপ।

চোখ পাকাইয়া শাসন করিতে গিয়া শেষে সে নিজেই হাসিয়া ফেলিল। মনে পড়িল, লক্ষ্মার কথা। চারুর সঙ্গে তার অনেক বোকামির গল্প করিয়াছে। পায়রা গ্রাম, সেখানকার কালী-মন্দির, চড়কের দিন ভৈরব নদীর উপর বাচ-খেলা···সে সব একদিন গিয়াছে! মনে একবার লোভ হইল, একবার ঘুরিয়া আসিলে হয়। তবু শান্তকণ্ঠে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, শোন চারু, অনর্থক পয়সা খরচ। বরঞ্চ খোকাকে আর একবার কলকাতায় দেখিয়ে আনা যাক।

চারু কাতরকণ্ঠে কহিল, আমার মন বলছে, ওখানে গেলেই খোকামণি ভাল হয়ে যাবে। তুমি 'না' বোলো না, মাথা খাও। তুমি হারাণকে বলে দাও, একটু বড় দেখে ছইওয়ালা নৌকো নিয়ে আসে। আমরা যাব আর চলে আসব।

পরদিন দিনক্ষণ খুব ভাল ছিল। শেষ-রাতের ভাঁটায় তারা রওনা

হইল। উঠিবার মুখে খোকা একবার একটু চোখ মেলিয়া তখনই আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বাখারির ফাঁকে ফাঁকে তেরছা জোছনার আলো·· খালের জল কল্-কল করিয়া নামিয়া আসিতেছে।· টানের মুখে নৌকা ছুটিতেছে, দাঁড় ফেলিবার আর বড দরকার হইতেছে না।

সিদ্ধেশ্বর বলিল, সেই যেতে হল, বন্ধু-কাকাকে যদি একটা চিঠি দিতাম। না হয় দুটো দিন পরে গেলেই হত। তিনি ঘাটে এসে থাকতেন, অসুবিধে হত না।

চারুবালা তাড়া দিয়া উঠিল, তুমি থাম দিকি। আমি কারও বাড়ি উঠব না।

জান না তাই। মামার সঙ্গে সে যে কি বন্ধুত্ব তাঁর—লোকে বলত, কেবল দেহটাই আলাদা। দেখা যদি হয় বুঝবে তখন।

জানি, জানি, বন্ধু-কাকা নয় গো—। খিল-খিল করিয়া চারু হাসিয়া ফেলিল। বলিল, কাকা নয়—কাকার মেয়ে। কিন্তু সে আর হচ্ছে না। সে লক্ষ্মীঠাকরুন কি আছেন? কোথায় কোন ভাল মানুষের ঘরে গিয়ে ষষ্ঠীবুড়ী হয়ে বসেছেন।

সিদ্ধেশ্বর রাগ করিয়া জবাব না দিয়া গলুয়ের দিকে ঝুপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

সকালে চোখ খুলিয়া সিদ্ধেশ্বর দেখে চারুরা মায়ে পোয়ে ওদিকে দিব্য আলাপ জমাইয়াছে। কি কথা তাহাদের তাহারাই বুঝে, এক এক কথার পর দু'জনেই হাসিয়া খুন। রোদ উঠিয়া গিয়াছে, নৌকা গ্রামের ভিতর সরু খাল দিয়া চলিয়াছে। একটি ছোট্ট বউ ঘাটে আসিতেছিল, মানুষের সাড়া পাইয়া ঝম-ঝম মল বাজাইয়া পাড়ে পলাইয়া গেল। কেওড়াগাছে ফুল ফুটিয়াছে, গাছের ডালপালা খালের জলে ঝুঁকিয়া

পড়িয়াছে একেবারে। হঠাৎ নজরে পড়িল, ঘন লতাপাতার আড়ালে একটি ছেলে গাছের একেবারে মাথার উপরে ; গোড়ার কাছে অল্প-কিছু বড় মেয়ে একটি, সম্ভবত ছেলেটিরই বোন। মেয়েটি আঙুল দিয়া নির্দেশ করিতেছে, ছেলেটি ফুল তুলিয়া কোঁচড় ভর্তি করিতেছে।

ফুল কি হবে খোকা ?

চারুও তাকাইয়াছিল। লব্ধ চোখে কহিল, সুন্দর মালা গাঁথা যায়।

উপর হইতে খোকা কহিল, ফুল আমরা খাই।

খাও ?

তলার মেয়েটি প্রাঞ্জল করিয়া বুঝাইয়া দিল, ওর মধ্যে মধু আছে—ফুলের দল ছিঁড়ে ফেলে আমরা খাই।

··অনেককাল আগেকার আর এক সকালবেলার ছবি। সিদ্ধেশ্বরের বয়স ইহাদের মতোই হইবে। সকাল তখনও ঠিক হয় নাই, শুকতারা আকাশ-প্রান্তে রহিয়াছে। ফাল্গুন মাস, সরস্বতী পূজার দিন। দরজায় ঘন ঘন করাঘাত হইতে লাগিল। দত্ত-গিন্নির ঘুম ভাঙিয়াছিল। বলিলেন, সিধু ?

বাহির হইতে সিদ্ধেশ্বর প্রশ্ন করিল, লক্ষ্মী ওঠে নি বুঝি ? তারপর দত্ত গিন্নি দরজা খুলিয়া দিলে ঘরে ঢুকিয়া সে ঘুমন্ত লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। ওঠ্—ওঠ্

লক্ষ্মী চোখ মেলিয়া আবার বন্ধ করিল।

সিধু কহিল, এই লক্ষ্মী--

উঁ—

আচ্ছা হাবা মেয়ে ! এর পরে একটা ফুল পাবি গাছে ?

এই উঠছি। বলিয়া ঘুমভরা চোখে লক্ষ্মী হাসিল। ঘুম ছাড়িতেছে

না, আবার সে চোখ বন্ধ করিল। তারপর ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া চোখ মিটি-মিটি করিতে লাগিল।

খোলা দরজা দিয়া আবছা আলো মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। বিছানা ছাড়িতে মন কিছুতে চায় না। হ ত দিয়া বিছানার এক প্রান্ত দেখাইয়া দিয়া লক্ষ্মী বলিল, তুমি বোসো। না হয় গড়িয়ে নাও একটু সিধু-দা। এখনও রাত আছে।

পথ কম নয়। পুবা দুইটা ভাঁটি নিয়াও পায়রায় পৌছ'ন দায় হইয়া উঠিল। বিকালে আসন্ন জোয়ারে জল থমথমে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সিদ্ধেশ্বর রীতিমতো বিরক্ত হইয়া বাহিরে আসিল। মাঝিকে কহিল, আবার এখনি নৌকো বাঁধবে তো?

মাঝি বুড়া হইয়াছে, সিদ্ধেশ্বরের ভিটাবাড়ির প্রজা, খুবই অনুগত লোক। একটু অপ্রস্তুতের ভাবে সে বলিল, আমাদের কি দোষ বলুন। এই রূপতবাসী বিলের আরম্ভ হল। আরও দু'খানা বাঁকের পর। নৌকো মোটে এগুতে চায় না—দেখ'ছন?

গুণ লাগাও। দড়ি নিয়ে দাঁড়িরা নেমে পড়ুক। এখানে চাপান দিয়ে যে রান্না-বান্না শুরু হবে—সে হচ্ছে না। বেলা থাকতে থাকতে পৌছতে হবে। কাজ-কর্ম সেরে নিয়ে আবার রাত্তিরবেলা নৌকো খুলব।

দু'জন দাঁড়ি বাঁধে নামিয়া গেল। গুণের টানে জল কাটিয়া নৌকা আগাইতেছে। ক্রমে ঝাপসা-ঝাপসা গ্রামের গাছপালা নজরে আসিল। খুশি হইয়া সিদ্ধেশ্বর বলিয়া উঠিল, ঐ যে সেই গেটওয়ালা খালের মুখ। না, হারাণ? খালটার নাম কি ভাল?

স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করিয়া সিদ্ধেশ্বর নাম মনে করিতে লাগিল।

মাঝি বলিয়া দিল, বকডোবার খাল—

আর ঐ ওপারের গ্রাম ?

মালঞ্চ।

ঐ হলগে মালঞ্চ ? বিস্ময়ভরা চোখে সেই দিকে চাহিয়া সিদ্ধেশ্বর বলিল, একদিন ওখানে বরযাত্রী হয়ে এসে যা কাণ্ড— তখন এই এতটুকু—ডুপুরবাত্রে দিদিমা দিদিমা করে সেকি কান্না !

হারাণ অনেকদিনের লোক, অনেকদিন হইতে চেনা-জানা। কহিল, তখন তো ঐ পায়রায় থাকতেন—

সিদ্ধেশ্বর বলিল, হ্যা মামার বাড়ি। মামা ছিল না—দিদিমাকে চোখে হারাতাম। বাবা নিজের কাছে রাখবেন বলে কত চিঠি লেখা-লেখি। একবার ছুটি নিয়ে নিজেই চলে এলেন। দিদিমা জবাব দিয়ে দিলেন, সে হবে না বাবাজি, তোমার ঐ পশ্চিমের মুলুক - তেপান্তরের দেশ —প্রাণ থাকতে বাছাকে আমি অতদূর, ছেড়ে দেব না। হলও তাই। যতদিন তিনি ছিলেন, আমিও রইলাম। দেশ ছেড়েছি দিদিমার শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়ে তার পরের দিন থেকে

নিশ্বাস ফেলিয়া সিদ্ধেশ্বর চুপ করিয়া গেল।

চারু বেচারী এমন সময় ছইয়ের মধ্যে একলা পড়িয়া পড়িয়া কি করিতেছে, না জানি। সিদ্ধেশ্বর ধীরে ধীরে উঠিয়া ভিতরে তার কাছে গেল। কহিল আর এসে পড়েছি। সামনে মালঞ্চ, তার পরে পায়রা। এস এস দেখসে এসে -

চারু খোকাকে খাওয়াইতে বসিয়াছে। নিস্পৃহ কণ্ঠে বলিল, আর আবার দেখব কি ?

দেখবে কি ? বটে। সিদ্ধেশ্বরের মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। বলিল, দেখবে মাঠ আর নেড়া-জমি। এ তোমার আরঙ্গাবাদ পেলে নাকি ? জন্মে তো বাংলাদেশ দেখ নি—বেরিয়ে দেখ একবার।

চারু উঠিল না, তেমনি ছেলে লইয়া রহিল। গুণ-গুণ করিতে করিতে আবার সিদ্ধেশ্বর বাহিরে আসিল। এই মাস দুই হইল বাপের মৃত্যুর পর তারা দেশে-ঘরে ফিরিয়াছে। পায়রা, মালঞ্চ—এই নামগুলা হঠাৎ তার মনে বড় দোল দিতে লাগিল। এই ধরনের মিষ্ট মিষ্ট নাম একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল সে। তাকাইয়া দেখিল, গ্রামের গাছপালা আরও স্পষ্ট হইয়াছে, নদীর দু'ধারে অন্তহীন সবুজ বিল, বিলের প্রান্তে সূর্য ডগমগ করিতেছে।

পায়রায় পৌঁছিতে বেলা ডুবিয়া আসিল। গাঙের ধারে হাট লাগিয়াছে। হাট ছাড়াইয়া একটা আমবাগানের পাশে নৌকা বাঁধা হইল।

কিছু হবে না আজ—কোন কাজ হবে না—রাত হয়ে গেল। সিদ্ধেশ্বর আপনাআপনি বকাবকি করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, জোয়ার থাকবে কতক্ষণ মাঝি ?

সবে তো এক পো।

নেমে ঘুরে আসি একটু। বলিয়া সিদ্ধেশ্বর ছইয়ের দিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, ভয়-টয় করে তো বল, তা হলে যাই নে।

বলিতে বলিতে সে দেখিল, চারু নিজেই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। স্ত্রীর হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, চল না চরের উপর দিয়ে খানিক ঘুরে আসি।

চারু কহিল, খোকা ?

কোলে ক'রে নাও।

চারু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে হয় না। অজানা জায়গা, ভর সন্ধ্যে বেলা—কি দোষ মন্দ হবে! এমনিই কিসে কি হচ্ছে, ভগবান জানেন।

সিদ্ধেশ্বর ততক্ষণে নামিয়া দাঁড়াইয়াছে। চারু প্রশ্ন করিল, আচ্ছা—কালীবাড়ি কতদূর এখান থেকে ?

ঐ যে ডান-দিকে—ঐ কালো কালো।

মুখ ফিরাইয়া গোধূলির আলোয় সিদ্ধেশ্বর চারুর ব্যাকুল মুখের ছবি দেখিতে পাইল। দেখিয়া তাহারও মনের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল বলিল, আমি আগে যাব কালীবাড়ি। সন্ন্যাসী ঠাকুরের ব্যাপার দেখে আসি।

চারু আমতা-আমতা করিয়া বলিল, আমিও না হয় যাই। পথ তো বেশি নয়—কি বল?

কিন্তু কাজকর্ম তো হবে না এখন—

চারু খোকাকে লইয়া পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল না, যেতেই হবে। ঠাকুরের পায়ে খোকামণিকে নামিয়ে না রেখে আমি স্বস্তি পাচ্ছি নে—

নদীকূল বহিয়া খানিকটা দক্ষিণে গিয়া বাঁ-হাতি সরু পথ, গ্রামে ঢুকিবার সোজা রাস্তা সেইটা। চারু সিদ্ধেশ্বরের পিছু পিছু চলিয়াছে। পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে ঢের। যেখানে মুখুজ্জেদের চণ্ডীমণ্ডপ ও সারি সারি খান পাঁচেক চৌরিঘর চিৎকার কোলাহলে সর্বদা মুখরিত থাকিত, সেখানে স্বল্পালোকিত নিস্তব্ধ নিবিড় জঙ্গল। মুখুজ্জেরা আর কোথায় উঠিয়া গিয়াছে, ভিটাগুলির উপর তলতা-বাঁশের ঝাড় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। একটু জোর পায়ে বাঁশতলা ছাড়াইয়া তাহারা ফাঁকায় আসিয়া দেখে, বাঁ দিকে আবার সেই ভৈরব নদী। অনেক দিন আগেকার পথ-ঘাট সিদ্ধেশ্বরের সমস্ত মনে পড়িতে লাগিল।

সামনে কালীবাড়ি।

অনেক কালের মন্দির। শোনা গিয়াছিল, সন্ন্যাসীঠাকুরের সামনে অন্তত হাজারখানেক লোক ধর্না দিয়া পড়িয়া থাকে। কিন্তু কোথায় বা সন্ন্যাসী, আর কোথায় বা কি? হাজারের মধ্যে একটি লোকের পাত্তা মিলিল না। অল্প অল্প জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। কোথায় বুঝি মৌরী-ক্ষেত

রহিয়াছে, তাহারই উগ্র সুগন্ধ-ভরা বাতাস···অদূরে দিগন্তপ্রসারী ভৈরবের শান্ত বহুবিস্তীর্ণ রূপার পাতের মতো জলরাশি। মন্দিরের মাথার উপরে এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ জন্মিয়াছে—শত শত ঝুরি নামিয়াছে, সেই ছায়াতলে আলো-আঁধারের মধ্যে ভাঙা-মন্দির অপূর্ব রহস্যাচ্ছন্ন দেখাইতে লাগিল। রোয়াকে মাথা ঠেকাইয়া তাহারা প্রণাম করিল।

নাটমণ্ডপের ভিটায় ও মন্দিরের উত্তরধারে কালকাসুন্দের ঘন জঙ্গল। চারিদিক চুপচাপ। জঙ্গলের মধ্যে খড়-খড় করিয়া উঠিল। সিদ্ধেশ্বর গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িল। দেখিল, ছায়ার মতো কি-একটা সরিয়া গেল। যেন একটা নারীমূর্তি। মূর্তি চোখের সামনে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতেছে! কোন কথা না কহিয়া গর্বিত ভঙ্গিতে সে যেন নিঃশব্দে লতাপাতার মধ্যে কতদূরে গিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কেমন আছ, লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী, আমি ফিরে এলাম—তুমি কথা বলবে না?

সিদ্ধেশ্বরের মনে হইতে লাগিল, একা লক্ষ্মী নয়, বছর পনের আগেকার সমস্ত ছেলেমেয়ে—প্রভাস পদ্ম কুমুদিনী সকলে নাট-মণ্ডপের উপর এই একটু আগে তাহাদের খেলিবার জায়গাটিতে জোট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, নব আগন্তুককে আগে চিনিতে পারে নাই—এখন চিনিয়া গ্রামের মধ্যে খবর দিতে ছুটিয়াছে।

লক্ষ্মী, লক্ষ্মী!

ডাকাডাকিতে লক্ষ্মী যেন নত মুখে কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বড্ড রাগ হয়েছে?

লক্ষ্মী আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল। চারিদিক নির্জন নিঃশব্দ। কেবল নদীর কল্লোল অতি ক্ষীণ একটানা সুরে কানে আসিতেছে। সরু বনপথে সিদ্ধেশ্বর পায়ে পায়ে আগাইতে লাগিল।

পিছনে চারুর কণ্ঠ। কোথায় চললে ?

হঠাৎ সিদ্ধেশ্বরের সম্বিত ফিরিল, নিজের এলোমেলো চিন্তায় হাসি আসিল। তাড়াতাড়ি বলিল, কই সিদ্ধবাবা বাবা কাউকে তো দেখছি নে। আচ্ছা, তুমি একটু বোসো। কাছেই মনা মিত্তিরের বাড়ি। খবর নিয়ে আসি।

চারু বলিল, কতদূর ?

কাছেই। যাব আর আসব। তুমি চাতালটার উপরে বোসো। ভয় করবে ?

চারু বলিল দেরি হয় না যেন। ঠাকুর রাত্তিরে হয়তো আর কোথায় থাকেন। সেইখানে গিয়েছেন বোধ হয়। কি বল ? তুমি সমস্ত খোঁজখবর নিয়ে এস। শিগগির এস।

কিন্তু সিদ্ধেশ্বর দৃষ্টির বাইরে যাইতে চারুর গা ছম-ছম করিয়া উঠিল। মনে হইল যাইতে দেওয়া ঠিক হয় নাই। অজানা অচেনা জায়গা, চারিদিক বন-জঙ্গল—রাত্রি হইয়া আসিতেছে। এ সময় একা এমন জায়গায় সে-লোকই বা চলিয়া গেল কোন বিবেচনায় ? খোকাকে ডাকিতে লাগিল, খোকা, ও খোকা, খোকনমণি—

খোকা বলে, ম্মা—

যাও তো, ডেকে নিয়ে এস। খুব ঝগড়া করবি। ওকি, ঘুম পাচ্ছে নাকি ? ও খোকা, ঘুমুলে হবে না।

খোকা হাই তুলিতেছে, চক্ষু দু'টি ঘুমের ভরে বুজিয়া আসিতেছে। চারু বলিতে লাগিল, ঘুমুলে হবে না তো খোকনধন। আমি বুঝি একা থাকব ? এই দেখ···ফুল নিবি ? ঘুমিও না সোনামাণিক— উনি আসুন, নৌকোয় গিয়ে ঘুমিও। চল—বেড়িয়ে আসি।

খোকাকে কোলে লইয়া চারু ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মন্দিরের পূর্বদিকে অপ্রশস্ত ভাঙাচোরা একটি দরজা। সেইদিকে আসিয়া দেহে তাহাব প্রাণ আসিল—একটি মানুষ, সাদা কাপড়-পরা একটি স্ত্রীলোক। ভাঙা দরজার সামনে উপুড় হইয়া পড়িয়া একান্ত মনে সে ঠাকুর-প্রণাম করিতেছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া বিড়-বিড় করিয়া ঠাকুরের কাছে কত কি কামনা জানাইয়া স্ত্রীলোকটি যখন মুখ ফিরাইল, চারুর সঙ্গে চোখাচোখি হইতে, সেই মুহূর্তে তার মনে হইল, এখনই ছেলে সমেত বুঝি সে মাটির উপর মুছিত হইয়া পড়িবে। মনে হইল, বাঁচিতে হইলে এই মুহূর্তে ছুটিয়া পলান দরকার—নতুবা রক্ষা নাই—অজানা গ্রাম প্রান্তে প্রাচীন মন্দিরের জঙ্গলাকীর্ণ জনহীন প্রাঙ্গণে প্রেতিনী তাহার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া লোলুপ সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া প্রবল বেগে টানিতেছে। পোড়া কয়লার মতো রং, একটা চোখের মণি উল্টাইয়া সাদা মার্বেলের মতো পাতার উপর আঁটিয়া রহিয়াছে, মুখের সর্বত্র গভীর ক্ষত—কে যেন নির্মমভাবে কাটারি চালাইয়া গিয়াছে।

চারুর পা তুলিবার ক্ষমতা হইল না, নিস্পলক তীব্র দৃষ্টির সামনে অসহায় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ কাঁচের মতো ঝকঝকে দাঁত মেলিয়া স্ত্রীলোকটি হাসিয়া উঠিল, দুই পা আগাইয়া খোকার দিকে হাত বাড়াইয়া কহিল, দাও দেখি এট্টু—

প্রবল আর্ত শব্দ করিয়া চারু ছেলে জাপটাইয়া ধরিল, খোকাও কাঁদিয়া উঠিল। সিদ্ধেশ্বর ফিরিয়া আসিতেছিল। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি? কি?

চারু তখন কাঁপিতেছে, কথা কহিতে পারিল না, আঙুল দিয়া মন্দিরের দিকে দেখাইল। তারপর ভাল করিয়া দেখাইতে গিয়া দেখিল মূর্তি অন্তর্ধান করিয়াছে।

কি হল চারু? হয়েছে কি?

একটু সামলাইয়া উঠিয়া চারু বলিল, চল, চল এখান থেকে। এমন জায়গায় আসা উচিত হয় নি। নিশ্চয় ভূত-প্রেত—

হাসিয়া অভয় দিয়া সিদ্ধেশ্বর বলিল, ক্ষেপে গেলে নাকি? গ্রামের কোন বউ-টউ হবে।

চারু ঘাড় নাড়িল। নৌকোয় চল শিগগির-

নৌকায় আসিয়া খানিক পরে চারু ঠাণ্ডা হইল। সিদ্ধেশ্বর বিরক্ত মুখে বলিতে লাগিল, অনর্থক পয়সার শ্রাদ্ধ। বললাম, তা তুমি কিছুতে শুনলে না। সন্ন্যেসী-টন্ন্যেসী মিছে কথা। এক বুজরুক এসে আস্তানা নিয়েছিল দিন কতক- পুলিশের ভয়ে রাতারাতি সরে পড়েছে।

চারু খুব অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। তবু বলিল, ভাল করে খবর নিয়েছ?

সিদ্ধেশ্বর বলিল, মনা মিত্তিরদের বাড়ি পেলাম না সব হাটে গেছে। একটা হাটুরে লোকের কাছে শুনলাম। খবর মিথ্যে নয়। আমি তো আগেই বলে ছিলাম। অর্থদণ্ড যা ছিল—হয়ে গেল। এবার ভোরের জোয়ারে ফিরে যাওয়া যাক। পরশু একটা মোকদ্দমা রয়েছে।

চারু তবু বলিল, ভাল জা গা থেকে খবরটা নিয়ে যাওয়া ভাল। এতদূরে এসে—

খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পরম যত্নে তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া চারু তাহার পাশে শুইয়া পড়িল। সঙ্গে চিড়া বাতাসা আছে, আরও খানিক রাত হইলে তাহার ব্যবস্থা হইবে। নদীর উপর দাঁড়ি-মাঝিরা রান্না চাপাইয়া ঢেমির আলোয় সুর করিয়া গঙ্গা-বন্দনা ধরিয়াছে। সিদ্ধেশ্বর তাহাদের পাশ দিয়া জুতা মস-মস করিয়া আবার বাহির হইয়া গেল।

আর বাজে জায়গায় খোঁজখবর না লইয়া একেবারে সোজাসুজি বন্ধু-কাকার বাড়ি। পরিষ্কার জ্যোৎস্নার মধ্যে নূতন চুনকাম-করা

ধবধবে পকাণ্ড বাড়ি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রশস্ত উঠানটিও বেশ পরিচ্ছন্ন। চেপটা-মাথা অসংখ্য পেরেক-আঁটা সেকেলে অতিকায় সিং-দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। ঝন-ঝন করিয়া সিদ্ধেশ্বর শিকল নাড়া দিল।

হাটের লোকজন ফিরিয়া গিয়াছে। ইহারই মধ্যে চারিদিক নিশুতি। সিদ্ধেশ্বর শিকল নাড়িয়া ডাকিতে লাগিল, দুয়োর খুলে দিন। কে আছ—? বঙ্কুকাকা ও বঙ্কুকাকা!

প্রবল বেগে সে দরজা ঝাঁকাইল। পুরানো দরজার কবজা খিল ও লোহালক্কড় খড়-খড় করিয়া বাজিতেছে। উপরের খোলা জানালার মাথায় শাদা জ্যোৎস্নায় কাহার যেন কাপড় উড়িতেছে। সিদ্ধেশ্বর সেই দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল, কে ও? লক্ষ্মী নাকি? শুনছ, আমি এসেছি—আমি সিদ্ধেশ্বর।

ঝনাৎ করিয়া ভিতরে শব্দ হইল। ঠেলিয়া দেখে কে ইতিমধ্যে দরজা খুলিয়া দিয়া গেছে। ভিতরে বড় অন্ধকার। কয়েক পা আগাইয়া সিদ্ধেশ্বর স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তারপর হাসিয়া উঠিয়া কহিল, এ ঠিক তুমি—আর কেউ নয়। হাড়ে হাড়ে দুষ্টুমি তোমার। এত বয়স হল, এখনও আছ তেমনি।

কয়েক মুহূর্ত সে স্তব্ধ থাকিয়া অদৃশ্যচারিণীর আত্মপ্রকাশ প্রতীক্ষা করিল। কিন্তু সাড়াশব্দ নাই। তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে অনুনয় করিয়া কহিতে লাগিল, আলোটা জ্বাল ভাই। সিঁড়ি ভুলে গেছি—আছাড় খেয়ে মরব শেষকালে?

বড় থামের মাথায় মন্দিরের মতো খিলান করা উঁচু ছাত—একপাশে ঘুরানো সিঁড়ি। সিদ্ধেশ্বর প্রতি মুহূর্তে প্রত্যাশা করিতে লাগিল, উহারই কোন একটির আড়াল হইতে উচ্ছল হাসি বাজিয়া উঠিল

বলিয়া। হঠাৎ বুঝি বিদ্যুতের মতো এক ঝলক আলো তার চোখের উপর আসিয়া পড়িবে।

উঠানের কোণে জ্যোৎস্নার ফালি বাঁকা হইয়া আসিয়া পড়িয়াছে। আরো খানিক সে অপেক্ষা করিয়া রহিল। তারপর বলিল, লক্ষ্মী চলে আয় ভাই, সারাদিন নৌকোয় নৌকোয় বড় কষ্ট গেছে।

চুনকাম করা ঘরের মধ্যে কথাগুলি গম গম করিয়া উঠিল। আবার চারিদিক নিস্তব্ধ। ক্রমশ সিদ্ধেশ্বর মনে মনে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। জোর গলায় ডাকিল, লক্ষ্মী।

জবাব নাই। সে দুম-দুম করিয়া পা ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল। আবার একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ভিতরের নিবিড়কৃষ্ণ অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বলিল, আমি চলে যাচ্ছি, ঠাট্টা-তামাসার সময় নেই। চলিতে চলিতে মুখ ফিরাইয়া বলিল, বঙ্কুকাকাকে বোলো—সিধু এসেছিল। ঘাটে রয়েছে, ভোরের জোয়ারে ফিরে যাবে।

পিছন হইতে কেহ দাঁড়াইবার জন্য অনুনয় করিল না। বাহিরের উঠান ছাড়াইয়া পথে পড়িবার মুখে সিদ্ধেশ্বর দেখিতে পাইল, তেতালার ছাদে রেলিং ভর দিয়া কে দাঁড়াইয়া আছে। অভ্রের মতো সাদা জ্যোৎস্না সেই রেলিং-এর উপর মেয়েটির সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া ঝিকমিক করিতেছে। মেয়েটি নির্নিমেষ চোখে চাহিয়া আছে, কিন্তু ডাকিয়া কিছু বলিল না। সিদ্ধেশ্বর বিরক্ত-মনে গ্রামপথ ধরিয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল

নদীর ধারে আসিয়া দেখিল, সেখানে মহা বিভ্রাট। পাঁচ-সাত নৌকার মাঝি-মল্লারা বিষম হৈ-চৈ লাগাইয়া দিয়াছে, চারু পাগলের মতো ছুটাছুটি করিতেছে। গণ্ডগোল শুনিয়া গ্রামের দু'জন ভদ্রলোকও আসিয়া জুটিয়াছেন। একজনকে সিদ্ধেশ্বর চিনিল, বুড়া মনা মিত্তির স্বয়ং। খোকাকে নাকি পাওয়া যাইতেছে না। খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া

চারু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ধড়-মড় করিয়া জাগিয়া দেখে খোকা নাই। কাঁদিতে-কাঁদিতে চারু ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর পায়ের গোড়ায় আছড়াইয়া পড়িল। টর্চ বাহির করিয়া সিদ্ধেশ্বর জলের উপর ফেলিল। মনা মিত্তির কহিলেন, সে সব কিছু নয় বাবা। ছইয়ের ভিতর শুয়ে ছিলেন, জলে পড়বে কি করে? মাঝি, তোমরা তো রান্না করছিলে— শেয়াল-টেয়াল যদি এসে থাকে, দেখতে পেলে না কিছু? আর অত বড় ছেলে শেয়ালেই বা নিয়ে যাবে কি করে?...

পাতি পাতি করিয়া খোঁজ চলিতে লাগিল। সিদ্ধেশ্বর ঘুরিয়া গাঁয়ের পথে চলিয়াছে, হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে একটু যেন খস-খস শব্দ। আলো ফেলিয়া দেখে, ভাঙা চাতালের আড়ালে বসিয়া কে-একজন আগাগোড়া সমস্ত কাণ্ড নিরীক্ষণ করিতেছিল, আলো দেখিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। তারপর না পলাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—উচ্চ ভয়ার্ত চিৎকার।

কে কোথায় আছ গো, মেয়েমানুষকে রক্ষা কর—

মাঝি-মাল্লারা বেশি দূরে ছিল না, ছুটিয়া আসিল। চারু আসিল, আর সবাই আসিয়া পড়িলেন।

অপ্রতিভ মুখে সিদ্ধেশ্বর বলিতে লাগিল, আচ্ছা মেয়েমানুষ তো! চেঁচিয়ে উঠল, আমি কিচ্ছু বলি নি, তাকাইও নি ওদিকে।

মনা মিত্তির বলিলেন, না বাবা কি আবার বলবে ওকে? এ একটা পাগলী। এই পাগলী ছেলের খবর রাখিস?

পাগলী সভয়ে মুখ তুলিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না তো—

এরই কাজ নিশ্চয়, ধর্ ধর্—

পাগলী ছুটিল, পিছু পিছু এতগুলি লোক। জঙ্গলে পা জড়াইয়া পাগলী পড়িয়া গেল। দলসুদ্ধ তখন প্রায় তাহার ঘাড়ের উপরে। আত্মরক্ষার জন্য হাত উঁচু করিয়া পাগলী বলিতেছে, ছেলে বাড়িতে আছে। দিচ্ছি দিচ্ছি, এনে দিচ্ছি গো, তোমরা মেরো না।...

দারুণ ক্রোধে হারাণ মাঝি বসাইয়া দিয়াছে এক লাঠি। পাগলী চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মনা মিত্তির হাঁ হাঁ করিয়া মাঝে আসিয়া পড়িলেন।

মেরো না—আহা মার কেন? ছেলের অযত্ন হয় নি কিচ্ছু। এমনি পাগল, কিন্তু ছেলেপিলে বড্ড ভালবাসে। পাড়ার কত লোকের ছেলেপিলে ঐ রকম করে নিয়ে যায়—

সিদ্ধেশ্বরের আক্রোশ তখন মিটে নাই। বলিল, কি ভোগটা ভোগাল বলুন তো!

মনা মিত্তির তাহার কাঁধের উপর হাত দিয়া আর্দ্রস্বরে বলিলেন, হোক গে বাবা। মেয়েমানুষ—ছেলেপিলে নেই, ত্রিসংসারে কেউ নেই, ...এই একটা পাগলের খেয়াল। চল যাই, ওর বাড়ি থেকে ছেলে নিয়ে আসি—

পাগল! সিদ্ধেশ্বর চলিতে চলিতে গজরাইতে লাগিল, মানুষকে অপদস্থ করবার বদমায়েসি কিন্তু বেশ আছে। কি চিৎকার করে উঠল তখন। লোকে ভাববে আমি বুঝি কোন রকম বেইজ্জত করে বসেছি।

উপস্থিত সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। একজনে বলিলেন, এ-ও আর এক পাগলামি!, ওর ধারণা, দেশসুদ্ধ লোক ওর জন্য পাগল। চেহারাখানা দেখেন নি বুঝি? এই পাগলা, ফের এই দিকে, এই দেখ্—

তখন তাহারা ফাঁকা রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে। মাথার উপর উজ্জ্বল মেঘহীন চাঁদ। পাগলী ফিরিয়া চাহিতেই চারু অস্ফুট শব্দ করিয়া মুখ ঢাকিল। সেই প্রেতিনী

উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া সিদ্ধেশ্বর প্রশ্ন করিল, এই বাড়িতে থাকে?

পাগলী বলিল, এই আমাদের বাড়ি।

চণ্ডীমণ্ডপের পাশে ছোট কুঠারি। খোকা তক্তাপোষের উপর আরামে ঘুমাইয়া আছে। কোথা হইতে ছোট দুইটা পাশবালিশ আনিয়া পাগলী দুই পাশে দিয়া দিয়াছে। চারু ছুটিয়া গিয়া ছেলে তুলিয়া লইল। ঘুম ভাঙিয়া ছেলে কাঁদিতে লাগিল।

পরম বিস্ময়ে মনা মিত্তিরকে সিদ্ধেশ্বর প্রশ্ন করিল, এই বাড়ি থাকে? এই তারণবাবুর বাড়িতে থাকে পাগলী?

মনা মিত্তির বলিলেন, তারণবাবু স্বর্গীয়। এই তাঁর মেয়ে।

লক্ষ্মী? সিদ্ধেশ্বর আলোটা আর একবার তাহার সর্বাঙ্গে ফেলিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিতে লাগিল, এই লক্ষ্মী? এই সেই লক্ষ্মী?

মনা মিত্তির তখন বলিয়া চলিয়াছেন, এমন অদৃষ্ট কেউ না করে বাবা! বিয়ের ঠিকঠাক—ভাল ঘর, ভাল বর—এমন সময় হল মার অনুগ্রহ। একটা চোখ গেল—এমন রং ছিল, তা-ও গেল পুড়ে। এদানি ভাগনেরা এসে বাড়ি দখল নিয়েছে—মিস্ত্রি লেগেছে, চুনকাম হচ্ছে, চৈত্র মাসের কটা দিন পরে আসবে তারা।

কিন্তু কিছুই সিদ্ধেশ্বরের কানে যাইতেছিল না। টর্চের আলো ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সে দেখিতে লাগিল। এই অনাবশ্যক ঘরটিতে লক্ষ্মীকে তারা ঠেলিয়া দিয়াছে। এখানে চুনকাম হয় নাই, সম্ভবত হইবেও না।... তাদের ছেলেবয়সের শিল্পকার্য দেয়ালের উপর কয়লা দিয়া-আঁকা জগদ্ধাত্রী এবং তাঁর বাহন সিংহটি মুছিয়া যায় নাই। দেয়ালে-পোঁতা একটা বড় লোহার আংটা,—বৈঠকখানার ঘড়িতে যে ক'টা ঘণ্টা বাজিত তারাও ঠিক দেয়ালে আংটা বাজাইয়া সেই ক'টা আওয়াজ করিত...সমস্ত রহিয়াছে।

নিশ্বাস ফেলিয়া সিদ্ধেশ্বর বলিল, চারু ফিরে চল, ভোরের জোয়ারে যেতে হবে।

স্বর্ণযজ্ঞ

শ্মশান-কালীতলায় এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। চেহারার যা জলুস, সিদ্ধপুরুষ-টুরুষ না হইয়া যায় না। বাবাচরণ শিকদার মশায় ভোর-বেলা স্টেশনে নামিয়া বাড়ি আসিতেছিলেন, তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া বর্ণনা দিলেন। দেখিতে দেখিতে কালীতলার মাঠ মানুষের মাথায় ছাইয়া গেল। সন্ন্যাসী ধ্যানস্থ: পরণে রক্তবাস, সমস্ত কপালটা ভরিয়া সিঁদুর-মাখানো, কাচের কড় ও রুদ্রাক্ষের মালায় বুকের উপরে তিল পরিমাণ জায়গা নাই। ভক্তের দল জমায়েত হইয়া বিপুল উৎসাহে আধ্যাত্মিক আলোচনা জুড়িয়া দিল।

ধ্যান আর উহার মধ্যে টিকিবে কতক্ষণ। সন্ন্যাসী চোখ মেলিলেন। অমরনাথ অমনি সকলের আগেভাগে গিয়া সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া পড়িল। তারপর মাথা তুলিয়া প্রশ্ন করিল, তৈলকন্দ চেন বাবাঠাকুর ?

সকলে হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল।

ও সুকেশীর মা, পাগল ঠেকাও. পাগল ঠেকাও—

ভিড়ের মধ্য হইতে এক জন প্রৌঢ়-গোছের বিধবা-মানুষ ছুটিয়া গিয়া পাগলের হাত ধরিলেন। কিন্তু অমরনাথ শুনিবার পাত্রই নয়। বলিতে লাগিল, দোহাই সন্ন্যাসী ঠাকুর. জান তো বলে দাও—কোথায় পাওয়া যায়। কাল-কেউটে রাত-দিন তার গোড়ায় পাহারা দিয়ে বেড়ায়। সে গাছের চারি দিকে তেল চুঁইয়ে দশ-বিশ হাত জায়গা ভিজে জবজবে—

ষণ্ডাগোছের জন-দুই-তিন উঠিয়া ততক্ষণে ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে তাকে সীমানার বাহির করিয়াছে।

সন্ন্যাসী হাত নাড়িয়া নিষেধ করিতে লাগিলেন এবং কেবল অমরনাথ বলিয়া নয়, হাতজোড় করিয়া সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, বাবা-সকল, মা-সকল, তোমরা বাড়ি-ঘরে যাও। আমি সামান্য লোক, কিচ্ছু জানি নে। আজকে শনিবার, অমাবস্যা, রোহিণী নক্ষত্র—সমস্ত সুপ্রসন্ন। একটা মস্ত কাজে বসেছি, তোমরা বাধা দিও না।

বলিয়া নির্বিকার মনে আবার তিনি চোখ বুজিলেন।

অশ্বত্থগাছের আবছায়ে একটি বছর-আষ্টেকের ছেলে বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল। ভিড় সরিয়া গেল, আর সে-ও কোলের ঝুলিটা ঠিক করিয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, বাবা।

কটমট করিয়া তাকাইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, ঠাকুর-

ছেলেটিও সংশোধন করিয়া লইল, ঠাকুর।

হ্যাঁরে হ্যাঁ, ঠাকুর—। সন্ন্যাসী ফিস-ফিস করিয়া তর্জন করিতে লাগিলেন, এক-শ বার বলে দিইছি না? ··কিন্তু এখন আর কোন কথা নয়। রাত জেগে ঘুম পায় যদি, শিকড়ের ঐ ঐখানটায় ঘুমিয়ে পড়।

পুনশ্চ ধ্যানস্থ হইবার আগে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চারিদিক দেখিয়া লইলেন। দেখিলেন, তখনও একটা লোক সাদা কাপড় মুড়ি দিয়া নদীর কিনারা ঘেঁসিয়া বসিয়া আছে।

কে?

মেয়েলোক। কুণ্ঠিত পদে ধীরে ধীরে আসিয়া সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে বসিল।

এখনও বাড়ি যাও নি সুকেশীর মা?

কোমল করুণার স্বরে সুকেশীর মা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন, বড্ড কষ্ট তোর মা, প্রথম দেখেই তা বুঝতে পেরেছিলাম। ঐ পাগল বুঝি তোর ছেলে?

ছেলে নয়, জামাই। আঁচল দিয়া চোখ রগড়াইয়া সুকেশীর মা ভাল হইয়া বসিলেন। বলিলেন, জামাই আমার মস্ত বিদ্বান। তাই দেখেই সুকেশীকে ওর হাতে সঁপে দিই। কলেজে মস্ত চাকরি করত। তারপর কি হয়ে গেল। কত চেষ্টাই হচ্ছে. কিছুতে কিছু হয় না—

সন্ন্যাসী গম্ভীরমুখে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন।

কি করব মা, আমার যে নিষেধ রয়েছে। আমার হাত-পা বাঁধা। ঝাড়ফুঁক মন্তোর-তন্তোর—করি নি যে কখনও, তা নয়— ঢের করেছি এককালে। কিন্তু ও-সব হল সিদ্ধাই, নিচের থাকের জিনিষ—

সুকেশীর মা তখন একেবারে দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া মাথা কুটিতে লাগিলেন। তুমি মহাপুরুষ বাবা,—কিছু করতে হবে না, শুধু দুখিনীর বাড়ি একটাবার পায়ের ধুলো দিও। ওতেই মঙ্গল হবে।

মাথা তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সুকেশীর মা আবার বলিতে লাগিলেন, দয়াময়, দয়া কি হবে? সে শুনব না; ঐ পাদপদ্ম ছেড়ে উঠব না আমি তবে।···ঐ যে হাসছ, আমার দয়াল। কখন যাবে? দুপুরবেলা? ঐখানে আজকে সেবা হবে।

হাসিমুখে সন্ন্যাসী বলিলেন, শুধু যাব আর চলে আসব। গৃহস্থের বাড়ি আমি সেবা নিই নে।

কিন্তু আমার বাড়ি? সেখানে তো কোন অনাচার নেই।

সন্ন্যাসী বলিলেন, তাই কি বলা যায় ?

এক মুহূর্ত্তে সুকেশীর মা'র চোখে যেন আগুন ফুটিয়া উঠিল।

বলা যায় ঠাকুর, খুব বলা যায়। সমস্ত গ্রামের মানুষ বলবে। পঁচিশ বছর বয়সে দু মাসের মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছি, সে-ও আজ বিশ-কুড়ি বছর হয়ে গেল। গ্রামসুদ্ধ মানুষকে জিজ্ঞাসা করে দেখ। সবাই বলবে। তবু কিসে যে কি হচ্ছে—

একটু চুপ থাকিয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ঠাকুর, হয় আমার পাগল জামাই সেরে উঠুক, নয় তো সুকেশী আমার পাগল হয়ে যাক। আমি যে চোখের সামনে আর দেখতে পারছি নে।

তখন বেশ বেলা হইয়াছে। মাঠের মধ্যে রৌদ্রের তেজ খর হইয়া উঠিয়াছে। ওপারে কুকশিমার বিলে চাষীরা এক বোমক চাষ করিয়া ছায়ায় আসিয়া বসিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন, মা, বাড়ি যাও—

সুকেশীর মা নিরুত্তরে উঠিয়া অশ্বত্থ-তলায় চেলা সন্ন্যাসীর হাত ধরিয়া তুলিলেন। বলিলেন, তুমি সেবা না নেও ঠাকুর, আমি এই গোপালকে নিয়ে চললাম। গোপাল আমার সেবা নেবে।

হাসিয়া কোমল কণ্ঠে সন্ন্যাসী কহিলেন, সেবা আমরা দু জনেই নেব তুই যে মহাভক্ত—তুই মুখ ভার করিস নে মা। একটি মুঠো চাল রেখে দিবি, মাত্র এক মুষ্টি—তার বেশি নয় কিন্তু, খবরদার। আমার একেবারে হাত-পা বাঁধা, বড্ড কঠিন নিষেধ রয়েছে কি না।

চাল ঐ এক মুঠাই, কিন্তু ভাব কলা-আতা-আনারসে যখন একটা ঝুড়ি ছাপাইয়া দ্বিতীয় আর এক দফা বোঝাই হইতে লাগিল সুকেশী কোন দিক হইতে দেখিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিল।

রও, রও, মা, আমি একটা সাজাই, আমায় একটু পুণ্যির ভাগ দেও। আজকে ক'জন্বর?

মা আমতা-আমতা করিয়া জবাব দিলেন, দু-জন মোটে। একটি একেবারে বাচ্চা। কেমন ফুটফুটে সুন্দর। বলিতে বলিতে চোখের কোণ চকচক করিয়া উঠিল, স্বর গাঢ় হইল, বলিতে লাগিলেন, তুই অমন মোটে দেখিস নি সুকেশী। ঠিক আমাদের গোপালের মতো। আজকে তুই রাগ করতে পারবি মা আমার—

কিন্তু রাগ কোথায়, অকস্মাৎ আর্ত অসহায়ের মতো সুকেশী কাঁদিয়া উঠিল।

ও মা, মা গো, তুমিও আমায় ছাড়লে। একজনে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী করে সর্বস্ব ভাসিয়ে দেছে, আবার তুমি যদি ছেড়ে যাও কার দুয়ারে যাব আমি।

বালাই। তোর কিসের অভাব মা?

ছেলেবয়স হইতে মেয়ের দেমাকই দেখিয়া আসিয়াছেন, আজকাল সেই মেয়ে যখন-তখন এমনি কাঁদিয়া ভাসাইয়া থাকে। মা সকল আয়োজন ফেলিয়া সুকেশীর চোখের জল মুছাইতে লাগিলেন। বলিলেন, কেন মা, তোর কিসের অভাব? আজকে সিদ্ধপুরুষ একজন আসবেন বাড়িতে—তোরই ভালর জন্যে—

সিদ্ধ না ছাই বলিয়া মায়ের হাত সরাইয়া দিয়া সুকেশী মুখের উপর আঁচল চাপিতে চাপিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

অতিথিরা যথাসময়ে দর্শন দিলেন। মা জল ও আসনের ব্যবস্থা করিয়া তাড়াতাড়ি উপরের ঘরে আসিয়া দেখেন, সুকেশী পরম নিরুদ্বেগে চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে।

প্রণাম করতে যাবি নে?

মাথা ধরেছে।

মা একটু ইতস্তত করিয়া কহিলেন, সেই ছেলেটা এসেছে।

হুঁ—বলিয়া সুকেশী পাশ ফিরিল।

বড্ড চমৎকার চেহারা কিন্তু। মা বলিতে লাগিলেন, চুলগুলো ঠিক আমাদের গোপালের মতো—

খোকার কথা বলছ মা? সুকেশী উঠিয়া বসিল, চোখ দু'টা ধ্বক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বলিতে লাগিল, ঐ গাঁজাখেগো রোদ-পোড়া ছেলেটা আমার খোকা? ছি ছি, অমন কথা আর বোলো না। প্রথমে একবার দেখে এলাম। আবার ভাবলাম, মা কি একেবারে মিথ্যে বলেছে? আবার গেলাম। ফিরে এসে মন বোঝে না—ফের আর একবার। অমন মিথ্যে করে আমায় লোভ দেখিও না মা, গোপাল আমার আর ফিরে আসবে না।

মা চলিয়া গেলেন। তার একটু পরেই অমরনাথ আসিয়া হি-হি করিয়া হাসিয়াই খুন। বলিল, মজা দেখে যাও গো, গজপুটে সাপ পাক হচ্ছে।·· আমায় একটা পয়সা দেবে?

কি হবে?

স্বরের অনুকৃতি করিয়া পাগল কহিল, কি হবে। দেখো বিকেল নাগাত। সাপের মুখের মধ্যে একভরি পারা। সেই পারায় ছুঁইয়ে দেব, আর পয়সা হয়ে যাবে সোনার মোহর। বিকেলবেলা দেখো।

স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া হঠাৎ সুকেশী সজল কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আমাদের খোকা কোথায় বল দিকি?

গোপালচন্দোর বাবু? একগাল হাসিয়া অমরনাথ বলিল

ঘুমুচ্ছেন বুঝি! খবরদার, ওকে জাগিয়ে দিও না যেন। তা হলে আর ছাড়বে না।

সুকেশীর চোখে জল চকচক করিতেছে, তাহারই মধ্যে হাসিয়া আবদারের ভঙ্গিতে বলিল, না, ডাকব আমি। খোকা—খোকা—

পাগল সভয়ে পিছাইয়া দরজা অবধি গেল। বলিল, ওরে বাস্ রে, তা হলে রক্ষে থাকবে না; কেঁদে-কেটে এমন বায়না ধরবে···না না আমি চললাম। পয়সাটা দাও।

সুকেশী শুনিল না। ওরে খোকা —মাণিক,—গোপাল!

পয়সা না লইয়া অতি ব্যস্তভাবে অমর পলাইয়া গেল। তখন নিশ্বাস ফেলিয়া সুকেশী ভাবিতে লাগিল, যদি ইহা হইত, ডাক শুনিয়া খোকা তার এতক্ষণে যদি জাগিয়া উঠিত। কোল ভরিয়া যেন খোকা ঘুমাইয়া ছিল, কত দিন কত বৎসরের পর জাগিয়া বসিয়া এই ঘর বারাণ্ডা সমস্ত ছাপাইয়া দুপুরের নিদারুণ স্তব্ধতা মথিত করিয়া কচি অথচ সূচের মতো তীক্ষ্ণ গলায় তেমনি করিয়া যদি খোকা অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠিত, মা, মা, মাগো! তবে ওঁর যাইতে হইত না আজ। আঙুল দিয়া সে খোকাকে দেখাইয়া দিত, ওরে খোকা ধর্ ধর্ ধর্—ঐ দেখ পালাচ্ছে···

ঘণ্টাখানেক পরের কথা। মা অগ্নিমূর্তিতে উপরে ছুটিয়া আসিলেন।

ওরে হারামজাদা মেয়ে, কি সর্বনাশ করেছিস্?

কি?

জান না কিচ্ছু? বলিয়া তিনি সুকেশীকে এক রকম টানিতে টানিতে নিচে নামাইয়া আনিলেন।

ঝুড়ি ভর্তি অত যে ফল, প্রত্যেকটি রসগোল্লার মতো করিয়া

কেরোসিনে চুবানো। ডাবের খোলেও জলের সঙ্গে অর্ধেকটা আন্দাজ কেরোসিন। সন্ন্যাসী এক ঢোক মুখে লইয়া তারপর খিল-খিল করিয়া হাসিয়া আকুল। সুকেশীকে দেখিয়া বলিলেন, এই ক্ষেপীর কাণ্ড? আমার বড্ড মজা লাগে। এক বেটী ক্ষেপী তো নাকে দড়ি দিয়ে শ্মশানে মশানে ঘুরিয়ে মারছে। ঘর-সংসার ছেড়ে তারই ধান্দায় সমস্ত জীবনটা গেল

মা বলিলেন, পায়ে ধর্।

অপ্রতিভ ভাব কাটিয়া সুকেশীর মুখ ক্রমশ কঠিন হইয়া আসিল। গুম হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

মা বলিলেন, ধর্—

কেরোসিন দিইছি, বিষ দিই নি তো? থর-থর করিয়া ওষ্ঠ কাঁপিয়া দু-ফোঁটা জল সুকেশীর গাল বহিয়া পড়িল। বলিল গোপালের নাম করে কেন তুমি ঠকালে মা তিন-তিনবার আমি এসেছি তাকে দেখতে। একবার ফিরে যাই, আবার আসি।... সাধু-সন্ন্যাসীরা কত অসাধ্য সাধন করেন শুনতে পাই। তোমার ঐ সিদ্ধপুরুষ একটা বার এক পলক তাকে দেখিয়ে দিলে তো পারতেন।

সন্ন্যাসীর হাসি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল।

মা'র কিন্তু অত রাগ একেবারে জল পড়িয়া গেল। সহসা কথা ফুটিল না, তারপর বলিলেন, কিন্তু ঐটুকু ঐ ছোট্ট ছেলে যে না খেয়ে থাকল তা ও একবার ভেবে দেখলি নে মা? মেয়েমানুষ হয়ে এমন নিষ্ঠুর তুই কেমন করে হলি? ও যদি তোর ছেলে হ'ত?

সুকেশী বোমার মতো ফাটিয়া পড়িল।

আমার মরা ছেলের কথা বার-বার তুলো না বলছি, আমি এক্ষুণি একদিকে চলে যাব।

মা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ন্যাসীর পায়ে আছড়াইয়া পড়িলেন। তুমি অভিশাপ দিও না ঠাকুর। মেয়ে আমার শোকে তাপে পাথর হয়ে গেছে। ওর মাথার ঠিক নেই।

একটি দুইটি করিয়া বারান্দায় তখন ভিড় জমিয়া গিয়াছে। পাড়ায় আর একটি মেয়েলোক নাই। সন্ন্যাসী চেলার হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সে হবে না বাবা। আমি একদণ্ডের মধ্যে সমস্ত আবার জোগাড় করে আনছি। সেবা না হলে যেতে দেব না, খুন হয়ে মরব।

ঐ তো হল রে। তারপর হাসিয়া ফেলিয়া সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন, রাগ করি নি মা। যেদিন ঘর-সংসার ছেড়েছি, ঐ আপদগুলোও সেদিন সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে এসেছি। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক বরং। আজকে দিনটা ভাল, যাবার সময় তাড়াতাড়ি একটা হোম করে দিয়ে যাই।

সুকেশীর মা কহিলেন, বেশ, ততক্ষণে আমি ওদিকে যা হয় গুছিয়ে ফেলি, কিন্তু রাত্রেও এখানে ফিরে আসতে হবে।

সে হবে, হবে। মা সকল, তাড়াতাড়ি আয়োজন করে দাও তো। এই সামান্য একটু ঘি, দু চার খানি কাঠ··· যা যা লাগে। আমার সময় বেশি নেই। খুব তাড়াতাড়ি।

মা গেলেন পুনশ্চ সেবার জোগাড় দেখিতে। এদিকে ছুটাছুটি করিয়া হোমকাঠের ব্যবস্থা হইল। ফুল-ভক্তি অপরাপর জিনিষ আসিল। তার এক কোণে একটা দেশলাই। সেটা হাতে তুলিয়া হাসিতে হাসিতে সন্ন্যাসী বলিলেন, বিলাতি আগুন। কি হবে এতে ?

খাটি স্বদেশি আগুন আবার মিলিবে কোথা ? সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

দেশলাই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, এ অশুচি। এতে কাজ হবে না। আমার কাছে এ-সবের ব্যাভার নেই।

সুকেশী নিস্পৃহভাবে একদিকে দাঁড়াইয়া ছিল। ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করিল, তবে?

সন্ন্যাসী বলিলেন, দেখতে পাবে মা লক্ষ্মী। একটু ধুনো আর নারকেলের খোসা আন দিকি।

মুখের কথা মুখে থাকিতে সমস্ত আসিয়া পড়িল। কৌতূহলে এতগুলি লোকের নিশ্বাস পড়ে কি না পড়ে! একজন ফিসফিস করিয়া বলিল, মন্তোরে আগুন হবে বুঝি?

তাচ্ছিল্যের ভাবে সুকেশী বলিল, ছাই—

সন্ন্যাসী মুখ তুলিয়া আবার হাসিয়া উঠিয়া নিরুত্তরে তোড়জোড় করিয়া বসিলেন। ধুনা ও নারিকেল-খোসা হাঁড়ির খোলে রাখিয়া মন্ত্র আরম্ভ হইল। প্রথমটা ধীরে ধীরে, ক্রমে বেগ বাড়িল, শেষে আর মন্ত্র পড়া নয়—কথাগুলি মুখের উপর যেন টগবগ করিয়া, ফুটিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে মা-চণ্ডীর দোহাই—সে দোহাই আকাশ ফুঁড়িয়া মা-চণ্ডীর দেশে পৌঁছিবার মতোই বটে। কোলের ছেলে সব আঁৎকাইয়া কাঁদিয়া ওঠে, মায়েরা হাত চাপা দিয়া কান্না ঠেকাইবার চেষ্টা করেন, ওরে, চুপ—চুপ! কিন্তু তা বলিয়া সাধ্য কি, কেহ এক পা নড়িয়া দাঁড়াইবে। চোখ দু'টা লাল হইয়া উঠিয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে হুঙ্কার দিয়া সন্ন্যাসী ডাকিতেছেন, দোহাই মা-চণ্ডী, দোহাই মা—

সুকেশী টিপ্পনী কাটিল, কই হে ঠাকুর?

সন্ন্যাসী জবাব না দিয়া হাঁড়ির মধ্যে হাত ঢুকাইয়া বন-বন করিয়া পাক দিলেন। তারপর প্রবলতম আরও দু-তিনটা দোহাই পাড়িয়া একেবারে স্থির অচঞ্চল। যেন পাথরের মূর্তি।

আর সঙ্গে সঙ্গে এদিকে বহু কণ্ঠের কোলাহল। মানুষের ভিড়ে তখন আর তিলধারণের জায়গা নাই। যারা পিছনে ছিল, হুড়মুড় করিয়া আগের লোকের ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। সত্যই হাঁড়ির মধ্যে মৃদু ধোঁয়া দেখা দিয়াছে। কেবল যে সত্যযুগেই মুখের কথায় আগুন জ্বলিত, তাহা নয় তাহা হইলে। ধোঁয়া ক্রমশ ঘন হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতে লাগিল। হঠাৎ কি হই।—কি হইল—বলিতে না বলিতে সুকেশীর মা দড়াম করিয়া একেবারে বাবা-ঠাকুরের পায়ের উপর।

সমাধি অন্তে সন্ন্যাসী ঠাকুর মৃদুকণ্ঠে মা-মা-মা করিতে লাগিলেন। একটু একটু করিয়া আবার সহজ মানুষ। হাঁড়িতে আগুন গন-গন করিতেছে। সন্ন্যাসী চারিদিকে একবার সগর্ব দৃষ্টি বুলাইয়া লইলেন। একটা যুদ্ধ জয় হইয়াছে, এমনি গোছের একটু হাসি মুখের উপর।

সুকেশীর মা তখনও পড়িয়া। যেন তার সম্বিৎ নাই। মাথায় মৃদু করাঘাত করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, ওঠ্, বেটী, ওঠ্ এই একবিন্দু একটু ছিটেফোঁটা, এতেই অবাক হোস—আর সে রত্নাকরের যে তল নেই। ক ৩ মণিমাণিক্য হাঙর-কুমীর তার কোলে পাশাপাশি রয়েছে, কিছু তার অবধি আছে?

এবারে হোম আরম্ভ হইল। সে-ও নিতান্ত সহজে সমাধা হইল না। বেলা একেবারে ডুবিয়া গেল। যাবার মুখে সুকেশীর মা পুনশ্চ মনে করাইয়া দিলেন, বাবা, আসবে তো রাত্তিরে?

হ্যাঁ—

তুমি ঐ হোমের ফোঁটা দাও সুকেশীর কপালে। একটু মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করে যাও। আয় হতভাগী—

কিন্তু কোথায় সে? কখন সরিয়া পড়িয়াছে। মা চিৎকার শব্দে ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, সুকেশী, সুকেশী!

সুকেশী এদিকে একেবারে চিলেকোঠায়। সে অনেকক্ষণ পলাইয়া আসিয়াছে, সন্ন্যাসী মন্ত্রবলে যখন আগুন জ্বালাইয়া সকলের তাক লাগাইয়া দিয়াছেন ঠিক সেই সময়। একা নহে—আসিবার সময় দেখে, রোয়াকের উপর বাচ্চা সন্ন্যাসীটি করুণ শুষ্ক মুখে বসিয়া আছে—ইসারা করিয়া ডাকিতে ছেলেটি দালানের মধ্যে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

কি গো খোকা-ঠাকুর, ভোগে জুত হয় নি?

মারিয়া ফেলিয়াও আবার মড়ার উপর খাঁড়া চালায়, ইহার কথার জবাব কি? ছেলেটি চোখ দু'টি তুলিয়া কাঁদ-কাঁদ ভাবে সুকেশীর মুখের দিকে তাকাইল।

এবার নরম সুরে সুকেশী প্রশ্ন করিল, ক্ষিধে পেয়েছে?

হ্যাঁ—

তুই গাঁজা খাস্?

হাত-মুখ নাড়িয়া তাড়াতাড়ি ছেলেটি সাফাই দিয়া উঠিল, না-না মা, কক্ষণো না—

মা বললে আমি ভিজি নে, আমার মায়া-দয়া নেই। রুক্ষ ভর্ৎসনার কণ্ঠে সুকেশী বলিতে লাগিল, কে শিখিয়ে দিয়েছে, বল শিগগির। ও তোদের ব্যবসাদারি ডাক—দশ দুয়োরে মেগে খাস 'মা' বলে ডেকে—না?

আবার নূতন করিয়া রাগের পাত্র হইয়া ছেলেটি ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত সুকেশী স্তব্ধ হইয়া তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ হিড়হিড় করিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া রান্নাঘরে পিঁড়ির উপর তাকে বসাইয়া দিল। তারপর নিজের হাতে ভাত বাড়িয়া দিয়া বলিল, খা—

যেই মাত্র বলা, অমনি আরম্ভ। খাওয়া তো নয়, টপটপ করিয়া

কোন গতিকে গোগ্রাসে গিলিয়া ফেলা। যেন কে আসিয়া কাড়িয়া লইয়া যাইবে, তার আগে যতটা বোঝাই করিয়া লওয়া যায়। চুপ করিয়া সুকেশী ক্ষুধিত বালকের খাওয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ চোখে জল আসিয়া পড়িল। আঁচল দিয়া মুছিয়া প্রশ্ন করিল, নাম কি তোর?

রতন।

মা বেঁচে নেই?

রতন ঘাড় নাড়িয়া সঙ্কেতে জানাইল, নাই। হাত ও মুখ সমানে চলিয়াছে, বারংবার অত কথা বলিবার ফুরসৎ কোথায়?

বাবা?

বড় একটা গ্রাস কোঁৎ করিয়া গিলিয়া ছেলেটি জবাব দিল, হুঁ-উ-উ—

তবে এই চুলোয় মরতে এ'সছিস কেন?

ইহার সদুত্তর দেওয়া কঠিন। অন্তত হুঁ-হাঁ করিয়া দু-এক কথায় দিবার নয়। সভয়ে রতন মুখ তুলিল। এই অপরাধে পুনশ্চ কেরোসিন-ভোগের ব্যবস্থা না হইয়া যায়।

সুকেশী বলিল, এই চেলাগিরি এখনি থেকে ছেড়ে দিবি, বুঝলি?

যাক—রক্ষা! রতন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ঘাড় নাড়িয়া তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল।

ঠিক তো? না মিথ্যে বলছিস?

হ্যাঁ বলিয়া রতন আবার সজোরে ঘাড় নাড়িল।

ঠিক এমনি সময়ে চটি ফট-ফট করিতে করিতে আসিল অমরনাথ।

ঘরে আছ, ও সুকেশী?

এস, এস—

ছুটিয়া সে আগাইয়া গেল। বলিল, এই তিন-পহর বেলায় মাথায় এক ফোঁটা তেল-জল পড়ে নি যে—হায় আমার কপাল! একটু তেল মাখিয়ে এক ঘটি জল ঢেলে 'দিয়ে ভাল করে মুছে-টুছে দিই আমি··· লক্ষীটি, দেব?

অধীর উত্যক্ত কণ্ঠে অমরনাথ বলিল, না, না, না—সময় কোথা? পাক শেষ হয়েছে, হাঁড়ি নামিয়েছি, কিন্তু পারদভস্ম খুঁজে পাচ্ছি নে। তাড়াতাড়ি একখানা আসন বিছাইয়া বসিয়া বলিল, চট করে দাও তো চারটি। বড্ড খিদে পেয়েছে।

আঁচল দিয়া মুখ মুছাইয়া স্বামীকে খাইতে বসাইয়া সুকেশী বাতাস করিতে লাগিল। দু-এক বার মুখে দিয়াই হঠাৎ অমরনাথ চিন্তিত মুখে খাওয়া বন্ধ করিল।

সুকেশী বলিল কি?

জবাব নাই, সে যেন অন্য এক জগতে।

সুকেশী ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, ওগো, কি হল বলবে না আমায়?

অমরনাথ বার-কয়েক আপন মনে মাথা নাড়িল। বহিল, পারা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই ভাবছি—সাপের দাঁড়ায় যদি লেগে থাকে। হুঁ, তাই-ই—

ভাত ফেলিয়াই সে উঠিল। সুকেশী খপ করিয়া ধরিয়া বলিল, সাপ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে আমি দেব না তোমায়—

সেদ্ধ-করা মরা সাপ যে! হা-হা করিয়া অমরনাথ হাসিতে লাগিল। বলিল, জ্যান্ত যখন ছিল, তখনই ছিল ভয়। তখন কি আর টের পেয়েছ? কিন্তু এত পারা দিলাম, তার এক ফোঁটাও তো পাই নে—

এক মুহূর্ত চুপ থাকিয়া দৃঢ়কণ্ঠে আবার কহিতে লাগিল, শোন

সুকেশী, দু-এক আনাও যদি পাই খুঁজে, একটু করে লাগাব পয়সার গায়ে, আর পয়সা হয়ে যাবে ঝকঝকে মোহর। কষ্টিপাথরে ঘষে দেখবে, একেবারে পাকা সোনা। তন্ত্রের কথা—তোমার আমার নয়। হাত ছেড়ে দাও, আমি যাই।

বার-কয়েক টানাটানি করিয়াও হাত ছাড়াইতে পারিল না। হঠাৎ পাগল সুকেশীর চোখাচোখি হইয়া টিপিটিপি হাসিতে লাগিল। বলিল, সুকেশী দেখনহাস, এ কাণ্ডখানা কি বল দিকি?

মনে আছে? মনে পড়ল নাকি? আনন্দে সুকেশীর মুখ জ্বলজ্বল করিতে লাগিল। বলিল, কত দিন অমন করে আমায় ডাক নি বল তো? আর সেই যে কি ছাই ভস্ম বলে ঠাট্টা করতে—

বলব? দেখবে, বলব? কৌতুকদীপ্ত চোখে মুখ ঘুরাইয়া সেই কতকাল আগের মতো অমরনাথ সুর ধরিল—

ও সুকেশী, দেখনহাসি,- ভালো-ও-বাসি-ই ই গো···

মুখ ফিরাইয়া হঠাৎ ছি-ছি করিয়া সে থামিয়া গেল। জিব কাটিয়া বলিল, সর্বনাশ! ছেলের সামনে—

রতন তখন খাওয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। পাগলে তাহার বড় ভয়। এমন-তেমন দেখিলে পিছনের দরজায় চম্পট দিবে এই মতলব। সুকেশীরও তার কথা মনে ছিল না। অপ্রতিভ মুখে তাড়াতাড়ি সে স্বামীর হাত ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

অমরনাথ বলিতে লাগিল, বেশ তুমি যা হোক। গোপালচন্দোর বাবু ওদিকে পিটপিট করে তাকিয়ে রয়েছেন, আর তুমি তার সামনে···বলিতে বলিতে মুখ-চোখের ভাব কেমন এক অদ্ভুত ধরনের হইয়া উঠিল। ব্যাকুল দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সে রতনের দিকে ছুটিল—

এস, এস—মাণিক এস, সোনামণি এস। ভয় কিরে পাগলা? সোনার লাটিম গড়িয়ে দেব, সোনার বাঁটের ছাতি।

রতন ততক্ষণে এক ছুটে একেবারে ঘরের বাহির।

অমরনাথ ধপ করিয়া আসনের উপর বসিয়া পড়িয়া হতাশ কণ্ঠে সুকেশীর দিকে চাহিয়া বলিল, এল না।

সুকেশী বলিল, আর আসবে না। পালিয়ে গেছে।

কোথায় গেল?

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সুকেশী বলিতে লাগিল, অনেক, অনেক দূর। কত দেশ-বিদেশ ছাড়িয়ে বাতাসে মিশে সে চলে গেল, আর আসবে না।

কেন?

তুমি তাকে ভালবাস না। তুমি কেবল সোনা সোনা করে বেড়াচ্ছ, তার দিকে ফিরেও চাইতে না। তাই সে রাগ করে চলে গেছে। আর আসবে না।

অশ্রু ঝর-ঝর করিয়া সুকেশীর গাল বাহিয়া ঝরিতে লাগিল।

বলিতে লাগিল, সে নেই, সে আর আসবে না। তুমিও ভুলে গেছ। একা আমি থাকি কাকে নিয়ে?

না আসে না-ই এল! বয়ে গেছে। হা-হা করিয়া উন্মাদ হাসির স্রোতে অমরনাথ ঘর ফাটাইতে লাগিল। বলিল, দুঃখ কিসের সুকেশী? খোকা গেছে, তোমায় আমি সোনার খোকা গড়ে দেব—একেবারে পাকা সোনা, কষ্টিতে কষে দেখো—

টলিতে টলিতে পাগল বাহির হইয়া গেল।

সুকেশী তখন রতনকে খুঁজিয়া আনিয়া একেবারে চিলেকোঠায় গিয়া দোর দিল। বাক্স খুলিয়া খোকার পোষাকের বোঝা টানিয়া

আনিল। তিন বৎসর আগে খোকা গিয়াছে, তিন বৎসর ধরিয়া সমস্ত পাটে-পাটে সাজাইয়া রাখা—সে জামা রতনের গায়ে কুলায় না, তবু টানিয়া ছিঁড়িয়া সুকেশী অধীর আগ্রহে সমস্ত পরাইতে লাগিল। বলিল, সব তোর- সমস্ত। আরও কত দেব। তুই এখানে থাকবি—বুঝলি?

রতন বলিল, হ্যাঁ।

সন্ন্যাসীরা সব ঠক-জোচ্চোর ভাল মানুষকে পাগল করে দেয়—ওদের পিছনে ঘুরে মানুষ ঘর-সংসার উচ্ছন্ন করে দেয়। ওদের সঙ্গে যাবি নে—বুঝলি?

রতন বলিল, হ্যাঁ।

এমনি সময়ে—সুকেশী! সুকেশী!

উপর নিচে মা চিৎকার শব্দে ডাকিয়া বেড়াইতেছেন। পোষাক খুলতে রতনের মন সরে না। হাসিয়া সুকেশী বলিল, কি পাগল তুই। এ গায়ে হয় নি—সবাই যে হাসবে। আমি তোকে নতুন নতুন কত পোষাক কিনে দেব বাবা। এ-ও থাকবে। চল, নিচে যাই।

•

সন্ন্যাসী তীক্ষ্ণ চোখে একবার দু-জনের দিকে চাহিলেন, তারপর রতনকে প্রশ্ন করিলেন, কোথায় ছিলি রে বেটা?

মার কাছে।

সে সুকেশীকে দেখাইয়া দিল।

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, তা বুঝেছি। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার উজাড় করছিলে। কম পেটুক তুমি! কিন্তু এদিকের সে সব -

সমস্ত ঠিক আছে ঠাকুর?

উত্তরসাধক?

রতন বলিল, হুঁ।

শব? করোটি? কারণবারি?

রতন বলিল, সমস্ত জোগাড় আছে, উত্তরসাধক সে সব সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।

সন্ন্যাসী নিশ্চিন্ত হইয়া নিশ্বাস ফেলিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, আর বেলা নেই চল্ বেটা। কিন্তু মায়েরা এদিকে কি মুশকিলে ফেলেছেন দেখ্। আমি বলছি, এত সব কি হবে—

সামনে নৈবেদ্যের মতো করিয়া সাজানো খান পঞ্চাশেক সিধা, বারকোশের উপর চাল-ডাল-তরকারি দু-একটা পয়সা ঠিক যেমনটি হইতে হয়। পাড়ার গৃহিণীরা সমস্ত সাজাইয়া গুছাইয়া চারি পাশে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন।

সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন, এ সবে কি দরকার মা-সকল? আজ বেলা নেই, নইলে মা'র কৃপায় একদানা চাল না রেধেও তোমাদের এই কয়জনকে ভর-পেট প্রসাদ পাইয়ে দেওয়া যায়—

বলিতে বলিতে আড়চোখে একবার সুকেশীর দিকে চাহিলেন। সে-মুখে ব্যঙ্গের হাসি নাই প্রত্যয় বা অপ্রত্যয় কোন ছবিই ফুটে নাই।

সন্ন্যাসী কাশিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, খবরের কাগজ পড় না মায়েরা? সেই সেবার রাজসাহীতে খড়ম পায়ে পদ্মা পার হওয়া··· লাটসাহেব কাগজে তুলে দিয়েছিল—হাজার দশ হাজার মানুষ, জজ ম্যাজিস্ট্রেট বড়-দারোগা, নৌকো স্টিমার সব কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে··। তাই বলি মা-সকল, ও-সব আমি নেব না— তোমরা বাড়ি চলে যাও।

কিন্তু ইতিমধ্যে রতন হাত পাতিয়াছে, মায়েরা সিধার পয়সাগুলি তুলিয়া তুলিয়া দিতেছেন। দেখিতে পাইয়া সন্ন্যাসী চোখ পাকাইয়া বলিলেন, কি হচ্ছে ?

রতন আবদার ধরিল, আমি নেব ঠাকুর।

নেও বাবা, নেও তুমি। যে ক-জন বাকি ছিল, তাড়াতাড়ি তাহারাও রতনের হাতের মধ্যে পয়সা গুঁজিয়া দিল।

সন্ন্যাসী গর্জন করিয়া উঠিলেন, লোভী, অর্বাচীন,—

কিন্তু তিরস্কারে শিশু বাগ মানে না, তেমনি দাঁড়াইয়া একবার সন্ন্যাসীর দিক চায়, একবার আর সকলের দিকে।

সন্ন্যাসী বলিলেন, ওরে বেহায়া, সেদিন অমনি হাত পাতালি—দু-হাত ভর্তি করে দিলাম না ?

রতন বলিল, সে তো সোনার পয়সা ঠাকুর, এ রকম পয়সা আমার একটাও নেই—

রাগ ভুলিয়া সন্ন্যাসী অকস্মাৎ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিস কি হতভাগা। চণ্ডীর কাছে তামার পয়সা চাইতে যাব ? লজ্জা করে না আমার ? সেই—সেই সাধায়ই যদি করতে হয় স্রেফ সোনা—

সন্ন্যাসী-ঠাকুর, সোনা করতে পার তুমি ?

হঠাৎ সে এক বিপর্যয় কাণ্ড। কখন যে ইহার মধ্যে অমরনাথ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কেহ দেখে নাই। সে তীব্র আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল, মুখে হাসির বিদ্যুৎ জ্বলিতেছে, মেয়েদের ঠেলিয়া সরাইয়া সে আগাইতেছে আর বলিতেছে, সোনা করতে জান তুমি ? ঠিক তুমি তৈলকন্দের গাছ চিনেছ তা হলে। সাপের মুখে পারাভস্ম হয় না—সমস্ত ধাপ্পা—আমি খেটে মরেছি—

এত কথার একটিও যেন কানে যায় নাই এমনি ভাবে ধীরে সুস্থে আপন মনে সন্ন্যাসী রতনের হাত ধরিয়া চলিলেন। একবার বেলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, একদম সন্ধ্যে হয়ে গেছে রে—চল্—চল--

পিছন হইতে সুকেশীর মা ডাকিলেন, আসবে তো ঠাকুর?

আসব। বড় শক্ত বাঁধনে বেঁধেছিস। ভক্তির বাঁধন বলিয়া মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিয়া ধীরে ধীরে তিনি অদৃশ্য হইলেন।

মাঠ ছাড়াইয়া গ্রাম ছাড়াইয়া নির্জন নদীকূলে গিয়া রতন ডাকিল, বাবা!

চুপ। চুপ!

চারিদিকে তাকাইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, বল্ ঠাকুর। মানুষ নেই, তাতে কি? অভ্যেসটাই খারাপ। কোন দিন মানুষের মধ্যে ডেকে বসবি।

রতন করুণ কণ্ঠে বলিল, না, তা ডাকব না, আজকে একটু ডাকি। উপরে নিয়ে গিয়ে আমায় আজ কত জিজ্ঞাসাবাদ করল, বলে, তোর বাবা কোথায় থাকে? আমি বললাম, কোথায় তা কে জানে?

বেশ, বেশ। সন্ন্যাসী খুব বাহবা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, আজকে ঠিকঠাক হয়েচে, একটাও ভুল হয়নি। তবু কাজ কি, তুই ঠাকুর বলেঃ ডাকিস।

নিঃশব্দে কয়েক পা গিয়া আবার সন্ন্যাসী কথা বলিলেন।

এত লোকে বাবা বলছে, আর তুই বললেই যে সর্বনাশ হয়, তা নয়। কিন্তু তোর ডাকটা যে অন্য এক রকমের—আমারই গোলমাল লেগে যায়। ঐ চেলা আছিস, বেশ আছিস—ঐ-ই ভাল। কি জানি কে কি ভাববে—যে দিনকাল পড়েছে—

বৈঁচিবন, বাঁশ, সারি সারি গোটা তিন-চার ছাতিম গাছ। সেইখানে জঙ্গলের মধ্যে বাপ ও ছেলে চুরি করিয়া বসিয়া রহিল।

•

সেদিনের সেই অমাবস্যার অন্ধকার, রাত্রে আকাশ ভরিয়া মেঘ করিয়া আছে, একবিন্দু বাতাস নাই, গাছের পাতাটি নড়ে না। সুকেশী ঘুমাইতেছিল। ঘুমের মধ্যে শুনিতে লাগিল গুন-গুন করিয়া গান হইতেছে—

ও সুকেশী মেধনহাসি,—ভাল-ও-বাসি-ই-ইগো—

মাথা হইতে পা পর্যন্ত তার থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। চোখ বন্ধ আছে, কিন্তু সে দেখিল, অস্পষ্ট ছায়ার মতো একখানা মুখ। সে মুখ দুলিতে দুলিতে কাছে—খুব কাছে—তার চোখ দু'টির চুল-পরিমাণ ব্যবধানে এক-একবার আসিয়া দাঁড়ায়, আবার ভাসিয়া চলিয়া যায়। ঘুম ভাঙিয়া কতবার সুকেশী উঠিয়া বসে—এখন আর মুখখানি নাই, গানের গুঞ্জন নাই, কিছু নাই—নীরন্ধ্র অন্ধকার, শূন্য বিছানা। চোখ বুজিতেই সঙ্গে সঙ্গে আবার—ও সুকেশী, ও সুকেশী। মনে হইতে লাগিল, যেন এই রাত্রে জানালা দিয়া কত জ্যোৎস্না আর কত বকুলফুল তার বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছে।

খুব ভোরবেলা, অল্প অল্প অন্ধকার আছে, কেহ কোন দিকে জাগে নাই। সন্ন্যাসী কেবল খট করিয়া বৈঠকখানার দরজা খুলিলেন, অমনি সুকেশী স্বপ্নমূর্তির মতো সামনে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসী ঠাকুর, শ্মশানে-মশানে ছোট ছেলে নিয়ে যেতে আছে? —আর অমন রাত্রিবেলা?

সন্ন্যাসী অবাক হইয়া চাহিলেন

সুকেশী বলিল, রতন তোমার সঙ্গে আর কোথাও যাবে না। ও এখানে থাকবে।

কেন?

ও আমার ছেলে।

ঘাড় নাড়িয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, দেবী চণ্ডিকা ওকে গ্রহণ করেছেন। ওর জন্মের রাশি-নক্ষত্র বড় চমৎকার. ওকে তুমি পাবে না মা।

ক্ষণকাল চুপ থাকিয়া সুকেশী প্রশ্ন করিল, পাব না?

দৃঢ় কণ্ঠে সন্ন্যাসী বলিলেন, না, কোন আশা নেই। আমার চিরজীবনের সমস্ত সাধনা ওর উপর নিয়োগ করেছি। ঐ ছোট ছেলে দেখছ কিন্তু ও ক্ষণজন্মা, অদ্ভুত।

স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ মর্মভেদী আকুল কণ্ঠে সুকেশী বলিয়া উঠিল, তবে আমার গোপালকে এনে দাও।

সন্ন্যাসী বলিলেন, বোসো তুমি মা।

রোয়াকের চাতালে সন্ন্যাসী বসিলেন, নিচে সুকেশী। ভোরের স্নিগ্ধ শীতল হাওয়া বহিতে লাগিল। মেঘ আর বড় বেশি নাই, আকাশ স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে।

সন্ন্যাসী প্রশ্ন করিলেন, গোপাল তোমার খোকা?

ম্লান ছলছল চোখে সুকেশী বলিল, শত্তুর। তিন বছর আগে চলে গেছে। সে গেল,—উনিও ছন্নছাড়া। তারপর এই দশা। এক সন্ন্যাসী এসে সোনা-তৈরির খেয়াল ধরিয়ে দিল, এখন রাত-দিন কেবল বনে-জঙ্গলে—আর সন্ন্যাসী দেখলেই তার পেছনে পেছনে ছুটে বেড়ান। সে থাকলে কি উনি এমনি করে সর্বস্ব ভাসিয়ে দিতে পারতেন?

সুকেশী আঁচলে মুখ ঢাকিল। নিশ্বাস ফেলিয়া সন্ন্যাসী উঠিয়া

দাঁড়াইলেন। বলিলেন, মৃত্যু অমোঘ, ওর হাত থেকে ত্রাণ নেই। কেউ তোমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না মা।

তবে আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও। সুকেশী কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল সন্ন্যাসী-ঠাকুর, উনি তো বেঁচে রয়েছেন, আবার ওঁকে আগেকার মতো করে দাও—

সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, আমাদের শক্তিতে বিশ্বাস আছে তোমার?

সুকেশী বলিল, না। কিন্তু বিশ্বাস আমি করব। তা ছাড়া যে উপায় নেই! আমার কেউ নেই, একলা আমি থাকি কি করে?

গর্বিতা নারী কান্নার ভারে আবার ভাঙিয়া পড়িল।

সন্ন্যাসী ধীর পায়ে মাঠের মধ্য দিয়া চলিলেন। অনেক দূর অবধি গেলেন, আবার ফিরিলেন। এমনি কতক্ষণ পায়চারি করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার যথাস্থানে বসিলেন। বলিলেন তোর ছেলের গায়ের সোনার গয়না চাই একটা কিছু—

কেন?

ভেঙে ফেলব।

সুকেশী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন, শোন্ তবে। ষড়রিপুর কাম প্রথম, ক্রোধ দ্বিতীয়, লোভ তৃতীয়, আর মোহ হলগে চতুর্থ। তোর স্বামীর সন্তান-মোহ বড় প্রবল ছিল। তাকে বড্ড বেশি ভালবাসতেন। নয়?

সুকেশী মাথা নাড়িল, ঠিক।

সেই মোহ এখন তৃতীয়ে পৌঁচেছে—লোভ, স্বর্ণ-লোভ এ কিছু অদ্ভুত ব্যাপার নয়। ঈড়া তার সুষুম্নার উপরে চৌম্বক প্রক্রিয়ার বহির্ভেদ হয়েছে। এখন বিষস্য বিষমৌষধম্। সেই যে সন্তান-মোহ—

তারই অভিজ্ঞানস্বরূপ তোর ছেলের গায়ের সোনা দিয়ে স্বামীর ঐ ভয়ানক স্বর্ণলোভের প্রতিক্রিয়া হবে। বুঝতে পারলি কিছু ?

সুকেশী বলিল, কিছু না।

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আশ্চর্য নয়। এ-সব গুহ্যাৎ গুহ্যতর। কেবল ঐ গহনা নয়, সিকি ভরি সিঁদুর চাই, কপিথমূল, তালের জটা, মোচব্বর। সে সমস্ত আমি গুছিয়ে নেব। সিঁদুর আর ঐ সমস্ত কারণবারিতে গুলে তার মধ্যে সোনা ফেললে একদম মিলিয়ে যাবে।

একদম যাবে ? কোন চিহ্ন থাকবে না ? একটুখানি বাঁকা হাসি সুকেশীর মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী শান্তকণ্ঠে বলিলেন অবিশ্বাস হয়তো কাজ নেই।

না না। সুকেশীর মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হইয়া গেল। বলিল, আমার মনই এই রকম ঠাকুর, তুমি কিচ্ছু মনে কোরো না। বিশ্বাস এবার আমাকে করতেই হবে। ডাক্তার, কবিরাজ, ফকির, অবধূত, কালী, শীতলা, ঘেঁটু, মাকাল কিছু আর বাকি নেই। হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে, একটা গয়নার আর কি-ই বা দাম। কেবল গোপালের গায়ের জিনিষ•••তাই

এতক্ষণে রতন উঠিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে উহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সকল ব্যথা ভুলিয়া সুকেশী স্নিগ্ধ হাসিয়া উঠিল। তার মাথায় হাত বুলাইয়া মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কত রাত্রে এসেছিলি ? খাওয়া হল কি না—আমায় তো একটি বার ডাকলি নে তুই রতন।

সে কিছু না বলিতেই সন্ন্যাসী আগে ভাগে বলিয়া উঠিলেন, মহাভক্ত তোমার মা। তিনি জেগে ছিলেন, সেবার কি কোন ত্রুটি আছে ? তোমায় ঘুম ভাঙাবে ও কি দুঃখে ?

সরল প্রশান্ত দৃষ্টি সন্ন্যাসীর মুখে স্থাপিত করিয়া সুকেশী বলিয়া উঠিল, সন্ন্যাসীর উপর আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু রতন আমার সন্ন্যাসী নয়, – সে আমায় কাল বলেছে, তোমার নাকি অনেক ক্ষমতা। তার কথা বিশ্বাস করি। গোপালের গয়না চাও, যা চাও, দিচ্ছি। ওঁকে আবার তেমনটি করে দাও, ঠাকুর।

ছেলের হাতের একগাছি বালা আনিয়া তাঁর পদপ্রান্তে রাখিয়া সুকেশী প্রণাম করিল।

সেইদিন গভীর রাত্রে আনন্দের আতিশয্যে রতন আবার ভুল করিয়া ডাকিয়া বসিল, বাবা।

ব্যস্ত হইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, এখন নয়, এখানে থাকতে নয়—

উজ্জ্বল মুখে রতন বলিতে লাগিল, গয়না কিন্তু আমার।

আচ্ছা।

দাও তবে।

না, না—এখানে নয়।

রতন বায়না ধরিল, একটিবার দাও শুধু। আমি দেখে রেখে দেব।

সন্ন্যাসী বলিলেন, অন্ধকারে দেখবি কি রে?

হাত বুলিয়ে দেখব।

ঝুলির মধ্য হইতে বালা বাহির করিতেই হইল, না করিলে শোনে না।

সন্ন্যাসী বলিলেন, একটা বদ্দি পচা পোষাক তোর গায়ে পরিয়ে দিল সেদিন, তা-ও তো নিতে পারলি নে। আর দেখ দিকি আমার কাজ! আস্ত সোনার গয়না—কত ভারী দেখেছিস?

রতন তখন গহনা পরিবার প্রাণপণ চেষ্টায় আছে। শেষে হতাশ হইয়া কহিল, হাতে ঢোকে না যে—

সন্ন্যাসী কহিলেন, ছোট্ট ছেলের জিনিষ—ঢুকবে কেন? বড় করে দেব।

মোটে এক হাতের হল—

আর একটা গড়িয়ে দেব।

নিশ্চিন্ত হইয়া শিশু তখন চোখ বুজিল। হাতের মধ্যে বালাগাছি। সন্ন্যাসী লইতে গেলে কিছুতে দিল না। ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, মুঠি তবু ছাড়ে নাই।

তারপর দিন-তিনেক কাটিয়াছে। স্বর্ণঘটিত সিঁদুর প্রস্তুতের নানাবিধ প্রক্রিয়া চলিয়াছে, সমাধা হইতে অতি সামান্যই বাকি, আর একটি দিন মাত্র লাগিবে। ভক্তের নির্বন্ধে ইতিমধ্যে সেবার বিষয়ে সন্ন্যাসী একেবারে হাল ছাড়িয়া বসিয়াছেন, একমুষ্টি চাউল লইয়া প্রথম দিনকার মতো জেদাজেদি আর নাই। দিনে রাত্রে প্রহরে প্রহরে নিরুপদ্রব সাধুসেবা চলিতেছে। আজিকার রাত্রিটা কাটাইয়া আগামী দিন অতি প্রত্যূষেই সন্ন্যাসী সুকেশীকে সিঁদুর পরাইয়া দিবেন, সিঁদুর পরিয়া সে গিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইবে,—সমস্ত ঠিকঠাক।

দুপুরবেলায় দু-জনে ঐ সকল পরামর্শই হইতেছিল, এমন সময় অমরনাথ দৌড়িতে দৌড়িতে আসিল। কোটরের মধ্য হইতে জবাফুলের মতো চোখ দু'টি ঠিকরিয়া বাহির হইতেছে, লম্বা লম্বা রুক্ষ চুলগুলি সজারুর কাঁটার মতো খাড়া। কৃশ সুদীর্ঘ ডান হাত সন্ন্যাসীর মুখের উপর তুলিয়া সে বলিয়া উঠিল, তৈলকন্দের গাছ চেন কি না বলে দাও—

সন্ন্যাসী বলিলেন, না।

মহাক্রুদ্ধ হইয়া অমরনাথ কহিল, তবে যে বললে সেদিন, মুঠোমুঠো সোনা তৈরি করেছ।

সন্ন্যাসী বলিলেন, তৈরি কোথায়? চণ্ডী-মা দিলেন।

মিথ্যে কথা। চণ্ডী-মা বাতাস থেকে দিলেন না কি? স্বর পর্দায় পর্দায় চড়িতে লাগিল। বাতাসে সোনার গুঁড়ো ভাসে, তাই চণ্ডী-মা অমনি হাতের উপর ধরে দিলেন। সোনার স্পেসিফিক গ্রাভিটি কত জান?

সন্ন্যাসী চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু পাগল থামিল না। বলিল, তুমি নিশ্চয় জান তৈলকন্দ। কালকেউটে সাপ রাতদিন সে গাছের গোড়ায় পাহারা দিয়ে বেড়ায়। এমনি তার বিষ, ছুঁচ বিঁধলে ছুঁচটা অবধি গলে জল হয়ে যায় ঠিক চেন তুমি - বলতে চাও না। কিন্তু আমি ছাড়ব না।

বজ্রমুষ্টিতে সে সন্ন্যাসীর হাত ধরিল। রোগা লোকটি, কিন্তু গায়ে যেন অসুরের বল। হাতের কনুই অবধি কড-কড করিয়া উঠিল।

ও কি? কি কর—কি কর—বলিতে বলিতে সুকেশী মাঝখানে আসিল। এতক্ষণে অমরনাথ সুকেশীকে দেখিল। সন্ন্যাসীর হাত ছাড়িয়া দিল। আর সে মানুষ নয়— অকস্মাৎ হাহাকার করিয়া উঠিল, হল না সুকেশী। সেই সাপ সিদ্ধ হল, কিন্তু পারা ভস্ম হয় নি। কাঁচা পারা জলের নিচে তলানি পড়ে রইল, কোন কাজে এল না।

মাথায় হাত দিয়া সে বসিয়া পড়িল। বলিল, এ-সমস্ত বুজরুকি, সমস্ত প্রক্ষিপ্ত। আসল হচ্ছে স্বর্ণ-তন্ত্র। কিন্তু তৈলকন্দ যে চেনা গেল না। তিন বচ্ছর বনবাদাড়ে ঘুরেছি, কত বেটা সন্ন্যাসী আশা দিয়েছে, শেষে পালিয়ে গেছে। একে আমি ছাড়ব না কিছুতে।

আবার পাগল ফুঁসিয়া উঠিল। তাহাকে টানিয়া পাশে বসাইয়া অনেক করিয়া সুকেশী শান্ত করিল। ভয়ে দুঃখে সুকেশী কাঁদিয়া ফেলিল।

ভাল করতে গিয়ে আমার কি হল, সন্ন্যাসী! উনি নিজের মনে বসে বসে জঙ্গল ঘাঁটতেন, যা-খুশি করতেন—আজকে এ যে ভয়ানক রাগ।

সন্ন্যাসী সপ্রতিভ হাসি হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, ঐ তো মজা। নিববার আগে আলোটা দপ-দপিয়ে জ্বলে। তৃতীয় রিপু লোভ এবারে দ্বিতীয়ে পৌঁছুল। এ-ক্রোধ আর কি-ই বা! এমন দেখেছি, খুনখারাপি করতে যায়—

শান্ত মানুষ খুনের কথায় আবার লাফাইয়া উঠিল। চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, আমিও খুন করব। শিগগির তৈলকন্দ বলে দাও। নইলে জান থাকবে না—

গতিক আরও ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইল। ঘণ্টাখানেক পরে দড়াম করিয়া দরজায় লাথি। চকচকে একখানা বলির খড়্গ হাতে পাগল ঘরের মধ্যে আসিয়া লাফাইতে লাগিল।

গর্দানে একটা কোপ…ব্যস! বলিয়া হা-হা করিয়া ছাত ফাটাইয়া হাসি। বলিল, বলে দাও শিগগির—

রতন সেখানে ছিল, আকুল চিৎকারে কাঁদিয়া উঠিল।

যে যেখানে ছিল, আসিয়া পড়িল। সুকেশী আসিতেই ভালমানুষের মতো তার হাতে খাঁড়াখানা দিয়া পাগল হাসিয়া বলিল, ঠাট্টা করছিলাম।

কিন্তু ভাল কথা নয় মা। সন্ন্যাসীর মুখ শুকাইয়া এতটুকু।

তাহারই মধ্যে একটু হাসির মতো ভাব করিয়া বলিতে লাগিলেন, আজকের দিনটা ওকে শিকল দিয়ে রাখ। একেবারে গোড়া ধরে টান দিয়েছি কি না, তাই অমন। মন্ত্রের ফল হাতে হাতে দেখে নাও।

ছাই মন্তোর, মিথ্যে কথা। পাগল চোখ পাকাইয়া উঠিল। বলিতে লাগিল, ঠাকুর, অনেক ঠকেছি। জবু-থবু বুঝিয়ে পালিয়ে যাবে —সে হচ্ছে না। রাতে আমি ঘুমুই না—তিন বছর ঘুমুই নি। ভাল চাও তো বলে দাও। আর নয়তো এক-শ কুচি করে রেখে যাব, কেউ ঠেকাতে পারবে না--

বাস্তবিক, ঠেকানো মুশকিল। সুকেশী নিবৃত্ত করিতে গেলে মাথা ঝাঁকাইয়া পাগল বলিয়া উঠিল, বলছ কি সুকেশী? ও জানে, তবু বলবে না। আমি খাই নে, ঘুমুই নে—খোকা মল, তব চোখের দেখা দেখি নি—ঘর-সংসার সমস্ত ভুলে গেছি—চাকরি ছাড়লাম, পাগল হলাম। কেবল একটু•••একটু•••একটুখানি—সামান্য এতটুকু কাজ—ঐ গাছটা মাত্র বাকি। সন্ন্যাসী জানে, তবু বলবে না।

আর পাগলের প্রলাপ নয়, আগাগোড়া কাহিনী এমন করিয়া বলিয়া যাইতেছে যে চোখের জল রাখা দায়। সুকেশীর মা সন্ন্যাসীর পায়ের উপর পড়িয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিল, বাবা, তুমি সমস্ত জান—বলে দাও, বাছা আমার সেরে উঠুক। তুমি আমাদের বাঁচাও।

পাগলও আসিয়া নতজানু হইয়া মিনতি করিতে লাগিল, বলে দাও, বলে দাও—

সন্ন্যাসী সুকেশীর দিকে চাহিলেন। করুণ সজল চোখে সে চুপ করিয়া ছিল, সে-ও আসিয়া পায়ের উপর পড়িল, ঠাকুর, আমি সমস্ত বিশ্বাস করি। তুমি আমাকে বাঁচাও। ওঁকে বলে দাও।

সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইয়া অমরনাথকে ডাকিলেন, এস আমার সঙ্গে—

দু-জনে সমস্ত বিকাল বনে বনে ঘুরিয়া সন্ধ্যার পর এক বোঝা গাছ-গাছড়া লইয়া উত্তরের কোঠায় অধিষ্ঠান করিল। তারপর দাউ-দাউ করিয়া উনান জ্বলিল। পাত্রের উপর জল ফুটিতেছে। ঘরে একটা মিটমিটে আলো। রাত্রি ক্রমে গভীর হইল। জল টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। আবছা অন্ধকারে উনানের উপর বড় বড় ফুলকি উড়িতেছে। গাঢ় নীল জলের বর্ণ। উগ্র কটু গন্ধে ঘরের বাতাস বিষের মতো লাগিতেছে।

আগুনের তাপে অমরনাথের সর্বাঙ্গে ঘামের ধারা চলিয়াছে। চোখ তুলিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, এইবার?

সন্ন্যাসী বলিলেন, সবুর।

চারিদিকে আবার নিঃশব্দতা। কেবল আগুনে ও ফুটন্ত জলে মিলিয়া একটা অদ্ভুত ধরনের ক্ষীণ আওয়াজ।

আবার খানিক পরে সন্ন্যাসী জ্বলন্ত একখানা চেলাকাঠ তুলিয়া আর একবার পাত্রের ভিতরটা দেখিলেন।

এখন?

ঘাড় নাড়িয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, উঁহু—

অমরনাথ অধীরকণ্ঠে কহিল, একেবারে শুকিয়ে গেল। কখন তবে?

শুকোক। সন্ন্যাসী নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলিলেন, শুকিয়ে এক বিঘৎ থাকবে, তখন ফটকিরি দিয়ে তার পর—

অমরনাথ নিবিষ্ট মনে কাঠি দিয়া জল মাপিতে লাগিল। সন্ন্যাসী টিপ-টিপ নিজের ঘরে গিয়া ঘুমন্ত রতনের কাঁধে হাত দিলেন।

ওরে রতন, ওঠ্—বেটা, ওঠ্—

রতন বার-দুই উঁ-উঁ করিল, উঠিবার লক্ষণ দেখাইল না। তখন সন্ন্যাসী হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। মুঠির ভিতর সেই

সোনার বালা, রোজ রাত্রে শুইবার সময় বালা তার চাই। ঠক করিয়া বালা মেজের উপর পড়িল।

মৃদু পায়ের শব্দ।

মুখ বাড়াইয়া সন্ন্যাসী আবছা দেখিলেন, ঠিক দরজার কাছে অমরনাথ চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তিক্ত কণ্ঠে কহিলেন, আবার এই অবধি ধাওয়া করেছ? বিকেল থেকে এক পা আগ-পাছ হতে দিচ্ছ না—ব্যাপারটা কি?

না না ঠাকুর, তা নয়। ঘরের মধ্যে আসিয়া অমরনাথ দুই হাতে সন্ন্যাসীর পদধূলি মাথায় লইল হাসিয়া বলিল, অনেক ঠকেছি কি না···যাবার সময় সাধু-মশায়রা প্রায়ই পায়ের ধুলো না দিয়ে চলে যান। তাই—

উত্তরের কোঠায় ফিরিয়া আসিয়া সন্ন্যাসী কাঠি ডুবাইয়া জল মাপিয়া মুখ বিকৃত করিলেন। বলিলেন, যা ভেবেছি তাই। এক বট বেশি শুকিয়েছে। দোষ তোমার বাপু। পই-পই করে বললাম—ফটকিরি না ফেলে তুমি আমায় দেখতে গেলে কেন?

এতে হবে না?

সন্ন্যাসী বলিলেন, অসম্ভব।

বেশ! তাতে কি? এক মুহূর্তে দ্বিধা না করিয়া অবিচল মুখে অমরনাথ পাত্র উপুড় করিয়া ঢালিল। এখনই পুনরায় চড়াইবার উদ্যোগ। একটু ক্লান্তি নাই, একটি সেকেণ্ড তার নষ্ট করিবার উপায় নাই, এমনি ভাব।

সন্ন্যাসী দরজায় পা বাড়াইয়া বলিলেন, এবার আমার বিশ্রাম।

আর একটু। বলিয়া পাগল পথ আটকাইয়া দাঁড়াইল। আবার সন্ন্যাসীর পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, ঠাকুর, সোনা যখন চকচক করবে

ঐ জলের নিচে, বিশ্রাম-টিশ্রাম তখন···তার আগে পা বাড়ালে খাঁড়া দিয়ে দুই ঠ্যাঙে দুই কোপ।

বলিয়া উদ্দাম হাসিতে হাসিতে বলিল, ঠাট্টা করলাম ঠাকুর। মিছে কথা।

ঠাকুর আবার স্বস্থানে ফিরিয়া কাঠ হইয়া বসিলেন। তখন আকাশে শুকতারা দপদপ করিতেছে, পূর্বাকাশে রক্তিম আভা। বিশাল পাত্র পরিপূর্ণ হইয়া আবার জল চড়িল। হিসাব করিয়া সমস্ত উপকরণ পরিমাপ করিয়া অমরনাথ জলের মধ্যে ঢালিয়া দিল।

সকালবেলা সুকেশী আসিয়া সে ঘরে ঢুকিতেই সন্ন্যাসী হাসিলেন—অনেকটা কান্নার মতো হাসি। বলিলেন, আজও সমস্ত দিন ছুটি নেই মা, এই সিদ্ধ হতে রাত্তির হয়ে যাবে। ততক্ষণ এই ঘরে আটক।

ঘাড় কাৎ করিয়া হাসিমুখে আবদারের ভঙ্গিতে সুকেশী বলিল, না—না, আমি নিয়ে যাচ্ছি—আমার একটু দরকার আছে। নিয়ে যাই লক্ষ্মিটি, কি বল?

অমরনাথ হাসিয়া বলিল, খুব—খুব! তুমি ওঁর কথা বিশ্বাস করলে সুকেশী? সমস্ত ঠাট্টা—

বাহিরে আসিয়া সন্ন্যাসী হাঁপ ছাড়িলেন।

সুকেশী বলিল, আমার সিঁদুর?

কালকে ভোরে। আজই হত, কিন্তু সমস্ত রাত্রি যে ছাড়ল না। না, আর নয়—নেহাৎ ছাড়বে না যখন, আজই দেব সোনা করে। কাল সকালে দেব তোর ভৈরবী-সিঁদুর। তারপর তোদের সুখে-স্বচ্ছন্দে রেখে বিদায় নিয়ে চলে যাব।

সুকেশী বলিল, হবে তো ঠাকুর? সত্যি বলছ, হবে?

তার চোখ ছল-ছল করিয়া আসিল। বলিল, ভাঙা কপাল, বিশ্বাস হতে চায় না···আমার গোপালের গয়না কি ভেঙে ফেলছ?

সন্ন্যাসী বলিলেন, হুঁ।

গাঢ়স্বরে সুকেশী বলিল, যেন সিদ্ধি হয় ঠাকুর। বড্ড সুখে ছিলাম, এখন কিছুই নেই। গোপাল নেই—তার গয়নাও দিয়ে দিলাম—ওঁকে যেন ফিরে পাই।

নিঃশব্দে মাথায় হাত দিয়া সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করিলেন।

সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। জল টগবগ ফুটিতেছে, অমরনাথ নিষ্পলক সেই দিকে তাকাইয়া। সারাদিন খায় নাই, তিলার্ধ উঠে নাই। এবারে বড় সাবধান, কিছুতেই কোন ত্রুটিতে যাহাতে পণ্ড না হইতে পারে। সন্ন্যাসীকেও সমস্তটা দিন একরকম ঠায় বসাইয়া রাখিয়াছে, উঠিবার চেষ্টা করিলে দেয়ালে-টাঙানো চকচকে সেই খাঁড়াখানা দেখাইয়া এমন ঠাট্টা করে যে উঠিতে ভরসায় কুলায় না।

সন্ধ্যার কাছাকাছি সুকেশীকে খবর দিয়া আনাইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, আমার জন্য নয় মা, আমার এ-সমস্ত অভ্যাস আছে। যেমন করে পার চারটি ওর মুখে দিয়ে দাও, নইলে অনর্থ করবে। যত্ন করে বুঝিয়ে-সুজিয়ে বসাও। আজকে শেষ-মুখ, তাই বড্ড বাড়াবাড়ি। খুব সাবধান আজকের দিনটা।

সুকেশী অনেক বলিয়া কহিয়া অমরনাথকে খাইতে বসাইল। সেই ঘরেই—ঘর হইতে এক পা আজ সে নড়িতে পারিবে না। কয়েক গ্রাস মাত্র মুখে পুরিয়াছে,—সন্ন্যাসী কাঠি দিয়া নীল জল নাড়িতেছিলেন, হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিলেন, দাও—ফট্‌কিরি দাও এইবার—

অমরনাথ খুঁড়ওয়া ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিয়া ফটকিরির গুঁড়া লইয়া বসিল।

জল শুকাইতে লাগিল। সুকেশীর মা ছুটিয়া আসিয়াছেন, রতন আসিয়াছে, এতগুলি চোখের দৃষ্টি ঠিকরিয়া যাইতেছে। সুকেশীর বুকের মধ্যে এমন ঢিব-ঢিব করিতেছে, যদি—

এমনি সময়ে জল শুকাইয়া পাত্রের মধ্যে ঝকমক করিয়া উঠিল—

সোনা! সোনা! সোনা!

প্রকাণ্ড পাত্রটি অমরনাথ সিংহের বিক্রমে মেজের উপর উপুড় করিয়া ফেলিল। অল্প জল এক পাশে গড়াইয়া গেল—পড়িয়া রহিল ছোট একটি সোনার তাল। হাত থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, অমরনাথ তাড়াতাড়ি কষ্টিপাথর লইয়া দু-তিনটা টান দিল। রেখাগুলি বিদ্যুতের মতো পাথরের গায়ে জ্বলিতে লাগিল।

সোনা!

সে চিৎকারে তার হৃৎপিণ্ড বুঝি-বা ফাটিয়া যায়। হাল্কা একটা পুঁটলির মত সন্ন্যাসীকে কাঁধের উপর বসাইয়া অমরনাথ সারা বাড়িময় তাণ্ডব নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তারপর শান্ত হইল যখন, অমরনাথ একেবারে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ।

সে-রাত্রে সে অঞ্চলে যত কিছু মিলিতে পারে, সমস্ত দিয়া সন্ন্যাসীর সেবা হইল। অমরনাথ স্নান করিল, তেল মাখিল, ফরসা জামা পরিল, দিব্য সহজ মানুষের মতো হাসিয়া আনন্দ করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া খাইল। তারপর আবার ধীরে ধীরে উত্তরের কোঠার দিকে চলিল। দেখিয়া সুকেশীর মা সভয়ে প্রশ্ন করিলেন, ওদিকে যে?

সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া অমরনাথ বলিল বাবা থাকতে

থাকতে আর একটা জ্বাল চড়িয়ে দিই গে। প্রক্রিয়াটা পাকাপাকি শিখে নেওয়া দরকার—ভুলচুক না থাকে। এবাবে একেবারে শ-খানেক ভরির মতো ব্যবস্থা করা যাক।

মা তবু মৃদু আপত্তি তুলিলেন, রাত্তিরটা থাকলে হত। বাবা তো থাকবেন এখানে, আমি ছেড়ে দেব না।

ক'দিন থাকেন ঠিক কি, আর একবার দেখিয়ে শুনিয়ে নেওয়া ভাল। দেরি করা কিছু নয়।

অমরনাথ চলিল। পিছন হইতে সুকেশী বলিল, আমি যাচ্ছি গো, আমিও শিখে নেব। মা-ও হাসিয়া সঙ্গ ধরিলেন। একটি পাগল ছিল, সোনায় এখন সবসুদ্ধ পাগল করিয়া দিয়াছে।

সন্ন্যাসী ক্লান্তকণ্ঠে বলিলেন, কিন্তু আমি যাব না। আমি বিশ্রাম চাই—

সুকেশী কাছে আসিয়া করজোড়ে মিনতি করিতে লাগিল, একটুখানি—আরম্ভটা বড্ড গোলমেলে শুনেছি। শুধু ঐটে আপনি দেখিয়ে দেবেন। এবারে আমি শিখে নিতে চাই।

সন্ন্যাসী ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, ভৈরবী-সিঁদুর?

সুকেশী বলিল, থাক গে।

সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া কাজ শুরু করিতে দুপুররাত্রি হইয়া গেল। অমরনাথ প্রণাম করিয়া কহিল, স্বচ্ছন্দে শুয়ে পড়ুন গে বাবা। যদি আটকায় কোন জায়গায়, তখন না-হয় ডেকে নিয়ে আসব।

সুকেশীর মা আজ আর শয়নের তদারক করিতে আসিলেন না, বলিয়া দিলেন, কম্বল-টম্বল পাতা আছে। আলো জ্বালা আছে। আমি যাব খানিকটা পরে। দেখে যাই এদের কাণ্ডকারখানা।

বলিয়া তিনিও ফুটন্ত জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

সন্ন্যাসী ঘরে আসিয়া দেখিলেন, দু'টি বিছানা পাতা—একটিতে রতন ঘুমাইয়া। নিজের বিছানার কম্বলটি তাড়াতাড়ি গুটাইয়া লইয়া রতনকে টানিয়া তুলিলেন।

ঘুমচোখে রতন বলিল, কি ?

পোশাকের বাক্সটাক্স যা দিয়েছিল তোকে, কোথায়- নিয়ে আয় শিগগির।

এ কর্ম নূতন নহে এবং কিছু ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবারও প্রযোজন হয় না। ফিস-ফিস করিয়া রতন বলিল, পোশাক উপরের ঘরে। দরজায় তালা দেওয়া। চাবি খুঁজে দেখব ?

সন্ন্যাসী বলিলেন, না—না। এক্ষুনি হয়তো এসে পড়বে, আর ধরে নিয়ে উত্তরের কোঠায় ঢুকিয়ে দেবে। না, পোশাকে কাজ নেই। তুই চল্।

তবু রতন এখানে ওখানে হাতড়াইয়া যাহা পাইল, লইল। পিছনের খিড়কি দিয়া জঙ্গলাবৃত গ্রাম-পথের উপরে আঁধারে আঁধারে দুইজনে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। হঠাৎ সন্ন্যাসীর পিছনের কাপড়ে টান। দৌড়িবার ঝোঁকে রতন হাঁপাইতেছে—হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে বলিল, ঠাকুর, বাক্স এনেছ ?

হুঁ—

দাও আমাকে।

দেব, চল্।

দৌড়িতে দৌড়িতে গ্রাম পার হইয়া গাঙের সাঁকো পার হইয়া তারা বিলে আসিয়া পড়িল। সরু আলপথ। হঠাৎ পা সরিয়া পড়িয়া রতন কাঁদিয়া উঠিল। বিনাবাক্যে সন্ন্যাসী তাকে কাঁধে তুলিয়া লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, হাতে কি রে ?

রতন শান্ত হইয়াছে। বলিল, সেই নতুন হাঁড়িটা। সামনে পেলাম তো নিয়ে এলাম। ভাঙে নি ঠাকুর, ও ঠিক আছে।

বিল শেষ হইয়াছে। একটা বটতলায় তাহারা বসিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, বোঁচকা খোল্।

বোঁচকা খুলিয়া রতন বাহির করিল গাঁজার কলিকা।

মুখ বাঁকাইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, ও এখন কোথায় কি হবে? আর কিছু নেই? দেখ দেখি খুঁজে।

এবং নিজে খুজিয়া পাতিয়া একটি বিড়ি বাহির করিয়া মুখে দিলেন।

রতন বলিল, আগুন?

মন্তোরে হবে। বলিয়া উন্টা গাঁট হইতে লাল দেশলায়ের কাঠি বাহির করিয়া হাঁড়ির তলায় খস করিয়া টানিয়া আগুন বরাইলেন। হাসিয়া বলিলেন, সেদিন আগুন করলাম, তুই দু'হাত ভর্তি পয়সা নিলি, সব ভুলে গেছিস?

শেষরাত্রির হিম-হাওয়া বহিতেছে, লতাপাতা খসখস করিতেছে, রতন চুপিচুপি আঙুল দিয়া দেখাইল, ঠাকুর সাদা কাপড়-পরা ঐ মানুষ—না?

দূর, উলুবন। পোড়া-বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া সন্ন্যাসী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন বাপ রে বাপ। বড্ড বেঁচে এসেছি। বাড়িসুদ্ধ পাগল। অমন আর দেখি নি।

এইবার আমার গয়না—

গয়না কি আছে? টানিয়া রতনকে একেবারে কোলের মধ্যে আনিলেন। কত দিন পরে শিশু আবার কোলে উঠিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, বালা ভেঙেচুরে ফুটন্ত জলের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলাম। নইলে

রক্ষা ছিল! যাদের গয়না, তারাই নিয়ে নিয়েছে বাবা। এবারে আর হল না।

নিক গে। স্নেহে গলিয়া গিয়া রতন খানিকক্ষণ কথাই বলিতে পারে না। বলিল, গয়না আমি চাই নে। কিন্তু এবার আমি বাবা বলব। আর ঠাকুর বলে ডাকছি নে।

জুয়াচোর নিঃশঙ্কে ছেলের গালে চুমা খাইয়া মাথাটি বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

এতক্ষণে সময় হইল বুঝি।

দোর খুলিয়া পা টিপিয়া টিপিয় সন্তর্পণে ছায়ামূর্তি ঘরের মধ্যে আসিল। আসিয়া করিল কি—জানলার ধারে যেখানে উমা একলা পড়িয়া আছে ঠিক সেইখানটিতে একেবারে শিয়রের উপর বসিয়া চোখের পল্লবের কাছে মুখটি নামাইয়া আনিল।

উমারাণী, উমারণী।

চুপ, চুপ ··কি লজ্জা।

মাঠের যেখানে যত জ্যোৎস্না ছিল, স্তূপাকার মল্লিকার মতো সব কি ঘরের মধ্যে আসিয়া নামিয়াছে? তেঁতুলগাছে কুয়োপাখী একটানা ডাকিয়া চলিয়াছে, ক্লান্তি নাই। ফাল্গুন-রাত্রির মিঠা হাওয়া এক একবার আসিয়া ছোট মেয়ের দোলনার মতো বিছানা-মশারি দোলাইয়া দিয়া যায়।

উমারাণী রাণী গো—জাগো, চোখ দুটো মেল দিকি একবার—

কিন্তু চোখ না মেলিলে কি হয়, কীর্তিকলাপ তোমার সব যে দেখা যাইতেছে। সুকুমার সুন্দর চোবের মুখখানি ভরিয়া চাপা হাসি। হাসিভরা সেই মুখ ধীরে ধীরে নিচু হইয়া আসিতেছে, আরো নিচু—আরো—আরো—আরো—

ধ্যেৎ, দুষ্ট কোথাকার।

খিল-খিল করিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইতে উমার ঘুম ভাঙিল।··· কে কোথায়। ঘরের দরজা বন্ধ। হঠাৎ এঞ্জিনের সুতীব্র বাঁশি।

নৈশ নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া চুরিয়া প্রলয়ের শব্দে বাড়ির পাশের রেললাইন বহিয়া এগারোটার গাড়ি স্টেশনের দিকে ছুটিয়া গেল।

পাড়ার গুটিপাঁচেক মেয়ে সোরগোল করিয়া রান্নাঘরে কাজে লাগিয়াছিল। বিভার স্ফূর্তিটাই সব চেয়ে বেশি। গাড়ির শব্দে তার টনক নড়িয়া উঠিল। ডাকাতের মতো ছুটিয়া সে এ ঘরের দরজা ঝাঁকাইতে লাগিল।

ওঠ্, ওঠ্, এসেছে—

অলস তন্দ্রাচ্ছন্ন হাসি হাসিয়া উমারাণী বলিল, আর নেই, চলে গেছে।

আবার তর্ক করে! খোল্ না দরজা। দেখ এসে কি চমৎকার বর—

জানে, পোড়ারমুখী আসিয়াছে যখন, না উঠাইয়া ছাড়িবে না। তবু যতক্ষণ পারা যায়। বলিল, তার বর—

দিবি? এদিক-ওদিক তাকাইয়া বিভা বলিল, দিতে পারিস প্রাণ ধরে?

উমারাণী স্বচ্ছন্দে এবং নির্ভয়ে বলিয়া দিল, নিগে যা—

ইস, দাতাকর্ণ একেবারে! বুঝেছি, বুঝেছি। কেদার মিত্তির চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

দুই সঙ্গীর মধ্যে কেদার মিত্রকে লইয়া আজকাল প্রায়ই এমনি আলোচনা হয়। আসলে কিন্তু মিত্র মহাশয় মোটেই তুচ্ছ ব্যক্তি নহেন। বাড়ি তাঁর ক্রোশ দুই-তিনের মধ্যে। প্রচুর মান-সম্ভ্রম. কোন অংশে কাহারও অপেক্ষা খাটো নহেন—না বিত্তে, না বয়সে। সম্প্রতি ভদ্রলোকের পর পর দুইটি মহা সর্বনাশ ঘটিয়া গিয়াছে। প্রথমে স্ত্রী গত হইলেন, তারপর সেই পিছু-পিছু সেজ ছেলেটা।

ছেলেটা আবার পথ কিছু সংক্ষেপ করিয়া লইল। রাত্রে বাপের সঙ্গে সামান্য একটু কথান্তর—প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখা গেল তার প্রাণহীন দেহ গোয়ালের আড়ার সঙ্গে ঝুলিতেছে। তারপর থানা, সেখান হইতে সদর। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ চুকিয়াছে এই মাসখানেকের বেশি নয়।

বিভা নিতান্ত ভালমানুষের মত বলিয়া উঠিল, কেদার মিত্তিরই মাথা খেয়েছে। তা তোর দোষ দেব কি ভাই? একসঙ্গে অমন ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনি একেবারে একটা পুরো সংসার—কার না লোভ হয় বল্।

দেখাচ্ছি তোমায়—

বলিয়া বড় রাগে রাগে দরজা খুলিয়া উমারাণী বিভাকে টানিয়া ঘরে লইল। বলিল, তুই বড্ড ইয়ে হয়েছিস। বিপদের সময় মানুষকে নিয়ে ঠাট্টা?

ঠাট্টা? ককখনো না। দুঃখ করছি। বলিয়া বিভা চেষ্টা চরিত্র করিয়া মুখখানা মলিন করিল। বলিল, বিপদই বটে। এমন সাধু-সজ্জন লোকেরও এমনি দুর্গতি হয়। থানায় নিয়ে বটতলায় নাকি খাড়া দাঁড় করিয়ে দিল। তখন দারোগাকে ধরম-বাপ বলে সমস্ত বেলা ধরে ভেউ-ভেউ করে কান্না। বাবার কাছে গল্পটা শুনে অবধি—

কথা আর শেষ করিতে পারিল না প্রবল দুঃখের যন্ত্রণা সেই বোধ করি বিছানার উপর একেবারে লুটোপুটি খাইতে লাগিল।

কিন্তু উমারাণী তাহাতে যোগ দিল না। ম্লান হাসিয়া বলিল, কিন্তু বুড়ো হোক, যা-ই হোক—ঐ কেদার মিত্তির ছাড়া তোর সখিকে আর কার মনে লাগল বল্ দিকি?

একটু চুপ থাকিয়া গভীর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, দাদুর অবস্থা দেখে

কান্না আসে ভাই। বুড়ো মানুষ—এদেশ-সেদেশ করে এক একটা সম্বন্ধ নিয়ে আসেন। মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে দাদুর আহার-নিদ্রা ত্যাগ। আজ এই দুপুর থেকে স্টেশনে যাবার ঝোঁক। বলেন, কলকাতার ছেলে পাড়াগাঁয়ে আসছে, পথ-ঘাট চেনে না—আগে গিয়ে বসা ভাল। যেন কলকাতার ছেলেকে খাতির করে গাড়ি আজ সকাল সকাল পৌঁছে যাবে। গাড়ি তো এল এই এতক্ষণে, আব সেই সন্ধ্যে থেকে স্টেশনে গিযে বসে আছেন।

বিভার চোখে জল আসিয়া পড়িল। দুইজনে বড় ভাব। উমার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, বসে বসে ঐ সব ভাবছিস? আজকে বর আসবার দিন, আনন্দ করতে হয়। চল্ দিকি রান্নাঘরের দিকে।

হঠাৎ উমারাণী বলিল, বিভা, একটা জিনিষ ধার দিবি?

কি?

তোর ঐ গায়ের রংটা। বড্ড ভয় করছে। ওরা দেখে শুনে চলে গেলে কাল আবার তোকে ফিরিয়ে দেব।

বিভা একেবারে আগুন হইয়া উঠিল।

তুই হিংসুক, তুই কাণা। একবার আয়না ধরেও দেখিস নে?

উমারাণী বলিল, সে ভাই তোর চোখে। তুই যদি পুরুষ হতিস—

আলবৎ। গ্রীবা দোলাইয়া প্রবল কণ্ঠে বিভা বলিতে লাগিল, তা হলে নিশ্চয় তোকে বিয়ে করতাম। বিয়ে না করে সকালে ঘাড়ের উপর এক কিল, আর সন্ধ্যায় আর এক দফা।

বলিতে বলিতে পরম স্নেহে উমাকে সে জড়াইয়া ধরিল। বলিল, চুলোয় যাকগে কেদার মিত্তির। আমি ছাড়া আর কারো চোখে লাগে না—বটে? আজকে তবে কি হচ্ছে? ছবি দেখে যে পাগল হয়ে রাজপুত্তুর ছুটেছে—

রাজপুত্র অর্থাৎ প্রশান্ত, কলিকাতায় কলেজে পড়ে। ফোটোগ্রাফ দেখিয়া বিচার-বিবেচনা করিয়া আজ সে নিজে আসিতেছে। সদয়গোপাল স্টেশনের বেঞ্চে বসিয়া ঝিমাইতেছিলেন। চারিদিকে ফাঁকা মাঠ। বড় শীত করিতে লাগিল। চাদরটা গায়ে দিয়া কম্ফর্টার ভাল করিয়া গলায় জড়াইয়া সোজা হইয়া বসিলেন। অবশেষে গাড়ি আসিল।

কলিকাতার ছেলে, দেখিয়াই চেনা যায়। দু-জন আসিয়াছে। একজন টুকটুকে সুন্দর, চশমা-পরা। অপরজন ফর্শা তেমন নয়, লম্বা-চওড়া সুগঠিত দেহ। গাড়ি হইতে নামিয়া সে-ই সর্বাগ্রে পরিচয় দিল—আমার নাম নিমাই গোস্বামী, নিবাস কোণাখোলা। পাত্র কিছুতে এল না।

সদয়গোপালের এমন ভাব হইল, বুঝি ঐখানেই বসিয়া পড়িবেন।

নিমাই বলিতে লাগিল, এত করে বললাম, চল যাই প্রশান্ত, আজকালকার দিনে এতে আর লজ্জা কি? শিয়ালদহে এসেও টানাটানি। কিছুতে নয়। আমাদের দু-জনকে গাড়িতে তুলে দিয়ে 'আসছি—' বলে চম্পট।

কিন্তু বয়স কম হইলে কি হয়, নিমাই গোস্বামী অতিশয় বিবেচক ব্যক্তি। বাড়ি পৌঁছিয়া বলিল, এই রাত্তিরে আর হাঙ্গাম হুজ্জুত করে কাজ নেই। আমরা কে? দেখা-টেখা হবে একেবারে সেই আসল মানুষের সঙ্গে শুভদৃষ্টির সময়। আমরা দেখব শুধু ভবিষ্যৎটা। বরঞ্চ খাবার-টাবারগুলো খুকিকে দিয়ে পরিবেশন করান। তাতে আন্দাজ পাওয়া যাবে।

বিভা ছুটিয়া গিয়া উমারাণীকে চিমটি কাটিল।

যা খুকি, খাবার দিগে যা। রাগের আর তার অন্ত রহিল না। খুকি! পিতামহ ভীষ্মেরা সব আসিয়াছেন কিনা, তাই খুকি বলা হইতেছে।

বিভার বাপ ভুবনবিহারী রায় চৌধুরি—চৌধুরিদের বড় তরফের কর্তা। তিনি আসিয়াছেন। রাত্রি একটু বেশি হইলেও গ্রামস্থ আরও দু-পাঁচ জন আসিয়াছেন। খাইতে খাইতে নানাবিধ উচ্চাঙ্গের আলোচনা চলিয়াছে। ভুবন চৌধুরি তো নিমাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাঁ হইয়া গিয়াছেন। ঐটুকু ছেলে এই বয়সে এত শিখিয়া ফেলিয়াছে—অবলীলাক্রমে এমন করিয়া কহিয়া যায় যেন তাহার বিদ্যাবুদ্ধির তল নাই। পাশের ঘর হইতে বিভা উঁকি দিয়া দেখিতেছিল। হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল এবং সেই আনন্দে ছুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে রান্নাঘরে গিয়া খবর দিল, বর আসিয়াছে উহারই মধ্যে আছে।

মেয়েরা নিরাশ হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, আবার পাশের ঘরে জমায়েত হইতে লাগিল। সদয়গোপাল আনন্দে জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যি রে বিভা, সত্যি?

বিভা চশমা-পরা ভদ্রলোককে দেখাইয়া দিল।

দেখছেন না, কি রকম ঘাড় গুঁজে পড়েছে? তাকায় না মুখ তোলে না। ঐ—ঐ—

সদয়গোপাল সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, উনি যে আর কি একটা নাম বললেন—

বলেছে তবে আর কি! একেবারে বেদ-বাক্য বলেছে। দাদুর যেমন কথা!

বিভা হাসিয়া খুন।

চশমা পরা ভদ্রলোকটির ইহার পর আর বিপদের অবধি থাকিল না। জানালার ওদিক হইতে কাপড়ের খসখসানি, চুড়ির আওয়াজ। ভদ্রলোক বুঝিলেন, দৃষ্টির শতঘ্নীবাণগুলা তাঁহারই পিঠে আসিয়া পড়িতেছে। মুখ ও চশমা থালার উপর ততই যেন ঠেকিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

ওদিকে উমারাণীও বিদ্রোহী। হাতের পাএটা ফেলিয়া ঝপ করিয়া সে বসিয়া পড়িল। বিভাকে বলিল, আমি পারব না তুই যা—

বিভা জিভ কাটিয়া বলিল, সর্বনাশ! তা করিস নে। জীবে দয়া করতে হয়। তা হলে ওর চোখ ফেটে জল বেরুবে। দেখিস নি, তোর পিছনে কি রকম চেয়ে চেয়ে দেখে চোরের মতো। দেখিস নি তাই – দেখলে মায়া হত।

উমার বিশ্বাস হইল কথাটা। মানুষটি এমনি দেখিতে গোবেচারার মতো, আসলে কিন্তু দুষ্টের শিরোমণি।

খাওয়ার পরে আবার পানের জন্য ডাকাডাকি। উমা হাতজোড় করিয়া বলিল, বিভা, লক্ষ্মী ভাই, এবারে আর কাউকে—

কিন্তু বিভার দয়ামায়া নাই। হাত-মুখ নাড়িয়া ঝগড়া আরম্ভ করিল, কি রকম মেয়ে তুই লো? আমাদের হলে আরও কত ছুতোনাতা খুঁজে বেড়াতাম। যা পোড়ারমুখী, যা শিগগির—

ভদ্রলোকেরা তখন সতরঞ্চির উপর সুখাসীন হইয়াছেন। উমারাণী গিয়া দাঁড়াইতে ভুবন চৌধুরি গুণব্যাখ্যা শুরু করিলেন, মেয়ে নয়—আমার মা লক্ষ্মী। আমার বিভা যা, এ-ও তাই। ঐ রং যা একটুখানি চাপা, নইলে কাজকর্ম স্বভাব-চরিত্র—দেখলেন তো যাই হোক কিছু। আহা মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে। বড্ড খেটেছিস বোস দিকি মা, বুড়ো ছেলের পাশে একটুখানি বোস্—

নিমাই গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িল। কলিকাতার ছেলে, কথায় ভুলিবার পাত্র নহে। বলিল, না খুকি, দাঁড়াও আর একটু। চুলটা একবার খুলে দিন না কেউ। ঐ দরজাটার ঐখানে চলে যাও খুকি, তাড়াতাড়ি যাও। একটু জোর জোর পায়ে। এইবার চোখ তুলে তাকাও তো, নজরটা দেখতে হবে—

অকস্মাৎ বিভা আসিয়া উমারাণীর হাত ধরিয়া লইয়া গেল। ভুবন হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলেন, ওরে কি করিস? ভদ্রলোকেরা যে—

বিভার জবাব আসিল, ভদ্রলোকেরা বিশ্রাম করুন। হাঙ্গামা হুজ্জুতের তো আজ কথা ছিল না বাবা। খুকি মানুষ—খেটে-খুটে এখন বড্ড ঘুম ধরেছে। ও আর চোখ তুলতে পারবে না।

সকালে উঠিয়াই নিমাই গোস্বামী বলিল, নমস্কার!

সদয়গোপালের মুখ শুকাইল, দেবতা রুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু অপরাধ তো তাঁহার কিছুই নাই।

নিমাই হাসিমুখে বৃদ্ধকে নির্ভয় করিল। বলিল, আর কত দেখব? ঐ তো হল। অনর্থক কাজ কামাই করে দরকার কি?

সদয়গোপাল শুনিলেন না, স্টেশন অবধি সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। গাড়ি প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ নিমাই অবাক করিয়া দিল। বলিল, মাপ করবেন আমাকে। একটু মিথ্যাচার রয়েছে, পাত্র নিজেই এসেছে।

বিভার সন্দেহ ঠিক তাহা হইলে!

বৃদ্ধ দুই স্তিমিত চোখের সকল প্রত্যাশা লইয়া চশমধারীর দিকে তাকাইলেন।

গোস্বামী পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে আমিই প্রশান্ত।

আরও আশ্চর্য হইয়া সদয়গোপাল বলিলেন, আপনার বাড়ি কি তবে—

কথা লুফিয়া লইয়া প্রশান্ত বলিল, কোণাখোলা নয়। জন্মে দেখি নি কখনো। তারপর উচ্চ হাসিয়া বলিতে লাগিল, পরিচয় দিলে কি অমন করে দেখা যেত? তা ছাড়া অন্যায়টাই বা কি? আপনার সঙ্গে তো ঠাট্টা-তামাশারই সম্পর্ক।

সাহস পাইয়া এতক্ষণ পরে বৃদ্ধ মুখ তুলিলেন। ঢোক গিলিয়া বলিলেন, মেয়ে তবে পছন্দ হয়েছে দাদা ?

হয়েছে। ফর্শাটি। আপনার ঐযে কে, হয় বলছিলেন না ?

সদয়গোপালের কথা ফুটিল না। তারপর অনেকক্ষণ পরে কথা যখন বলিলেন, যেন হাহাকারের মতো শুনাইল। বলিলেন, ও ভুবন চৌধুরির মেয়ে, ওর পাত্রের অভাব কি ? আমার এই মা-বাপ-মরা বাছার একটা গতি করে দাও তোমরা।

প্রশান্ত উদাসীনের মতো আর এক দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর বলিল, গাড়ি এসে পড়েছে। আচ্ছা, নমস্কার! ভুবন চৌধুরি মশায়কে বলবেন ঐ কথা। আয় সুনীল, দাঁড়িয়ে রইলি যে ?

গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু চশমাধারী ছেলেটি নড়িল না। এক মুহূর্ত সে সেই ক্লিষ্টদেহ বৃদ্ধের দিকে তাকাইল। কথা সে কাল হইতে বড় বেশি কহে নাই, গাড়ির সামনে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমার নাম সুনীলকুমার রায়, বাড়ি প্রশান্তদের ওখানে। আমার সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর করে দেখবেন। আমি অযোগ্য, কিন্তু যদি আপনার পৌত্রীকে—

বৃদ্ধ যেন পাগল হইয়া উঠিলেন, শুষ্ক চোখ এতক্ষণে সজল হইয়া উঠিল। অধীর আকুল কণ্ঠে বারম্বার বলিতে লাগিলেন, আমার উমারাণীকে নেবে তুমি ? দুঃখিনীকে পায়ে ঠাঁই দেবে তুমি দাদা ?

অস্ফুট স্বরে সুনীল বলিল, যদি দেন দয়া করে। এবং তারপর সে-ই বা কি বলিল, বুড়াই বা কি বলিতে লাগিলেন—গাড়ির শব্দে লোকজনের কোলাহলে তাহার একবর্ণ শোনা গেল না।

বৃত্তান্ত শুনিয়া ভুবন চৌধুরি মহা খুশি। বলিলেন, বেশ হয়েছে,

দিব্যি হয়েছে। এক ঢিলে দুই পাখী। হীরের টুকরো ছেলে ও-দু'টি। দেখেই বুঝেছি।

এবং আরও ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য পরদিনই রওনা হইয়া গেলেন। ফিরিতে দিন আষ্টেক দেরি হইল। খিড়কিতে পা দিয়াই আনন্দোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, উলু দাও সব—শঙ্খ বাজাও—

উদ্যোগী পুরুষ। একেবারে বিয়ের তারিখ পর্যন্ত ঠিক। সামনের চৈত্রটা বাদ দিয়া বৈশাখ মাসের এগারোই।

হাত-পা ধুইয়া চৌধুরি মহাশয় বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলেন, সদয়গোপাল আসিয়া ফরাসের এক পাশে চুপচাপ বসিয়া আছেন। হাঁ, সম্বন্ধ বটে। সেই কথাটাই সর্বাগ্রে উঠিয়া পড়িল। এমন ঘর-বর ভুবন স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। প্রায় বেকুব হইতে বসিয়াছিলেন, তারপর বুদ্ধি করিয়া নিজের হাতের হীরার আংটি বরের আঙুলে পরাইয়া মান বাঁচাইয়া আসিয়াছেন। সদয়গোপাল খুব ঘাড় নাড়িয়া ভুবনের বুদ্ধির তারিপ করিলেন, তারপর কাছে গিয়া বসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ ভুবন, আর ঐ খবরটা নিয়েছিলে কিছু?

ভুবন বলিলেন, নেব না কি রকম। সে-ও তো এবাড়ি।

ওটাও ভাল সম্বন্ধ। উনিশ আর বিশ। বরঞ্চ এক হিসেবে উমার অদৃষ্ট আরও ভাল। শ্বশুর-শাশুড়ি দুই-ই বর্তমান। শ্বশুর নিশি রায় —ও অঞ্চলের ডাকসাইটে লোক। আমি গিয়ে পরিচয় দিলাম। ভদ্রলোক তখনই পুকুরে জাল নামিয়ে দিলেন।

সদয়গোপাল বলিলেন, আর সুনীল যে কথাটা বলে গিয়েছেন?

ভুবন ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, তা-ও হল। নিশি বাবু বাইরে লোক মন্দ নন। বললেন, ছেলের পছন্দেই আমাদের পছন্দ। উপযুক্ত ছেলে—আমরা কি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাব?

আনন্দে বিহ্বল লইয়া সদয়গোপাল বলিলেন, ভুবন, তবে তোমাকে আরো একদিন যেতে হচ্ছে। ঘাড় নাড়লে হবে না—আমিও যাব। গিয়ে বলব, আমার দুই নাতনিকেই একদিনে নিতে হবে—ঐ এগারোই বোশেখ। নইলে শুনব না।

ভুবন বলিলেন, তা-ও বলেছিলাম। কিন্তু বিস্তর অজুহাত। ছেলেরই নাকি আপত্তি পরীক্ষার আগে সুবিধা হয়ে উঠবে না। বাবা বাড়ি নেই—আসল কথাটা শাই বোঝা গেল না। আমার মনে হয়, বুড়োরও কিছু দুষ্টুমি আছে।

তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া দু-জনে অনেক পরামর্শ চলিতে লাগিল।

এদিকে খুব ঝাঁকাইয়া প্রাণপণ শক্তিতে উলু দিয়া উমারাণী হাপাইতে হাপাইতে অবশেষে বিভাকে নির্জনে ধরিয়া বসিল।

ওরে রাক্ষুসি, সত্যি সত্যি আমার বর ছিনিয়ে নিলি?

এই কথাটাই বাঁকা হাসির সঙ্গে ক'দিন ধরিয়া মেয়েমহলে মুখে মুখে চলিতেছে, উমারাণীকে দেখিলেই সকলে চুপ করিয়া যায় সেই কথা মনে করিয়া লজ্জায় সহসা বিভার উত্তর যোগাইল না। উমা বলিতে লাগিল, তুই ডাকাত। ডাকাতি করে বর কেড়ে নিয়ে শেষে এদ্দিন পরে আমাদের ছেড়েছুড়ে চললি—

ছাড়ব কি সহজে? বিভা সামলাইয়া তখন ঝগড়া শুরু করিল।

অত আহ্লাদ করিস নে রে। না হয় দুটো একটা মাসের এদিক-ওদিক। সেখানেও পাশাপাশি বাড়ি। তোর সঙ্গে চুলোচুলি না করলে একদিনেই যে মরে যাব, ভাই—

তারপর আবার বলিতে লাগিল, বোশেখে না হয় কলেজের এগজামিন—জোষ্ঠিতে বাঁচবে কি করে? পুরুষগুলো ভাই বড্ড

বোকা। সেই সেই মাথা খুঁড়তে হবে, খামকা আমাদের চটিয়ে রেখে দেয়। তখন আচ্ছা করে কৈফিয়ৎ নিবি। ছাড়িস নে—বুঝলি?

উমা বলিল, দয়ার উপর জুলুম?

বিভা মুখ ঘুরাইয়া বলিল, কিসের দয়া লো? মেয়েমানুষ গাঙের জলে ভেসে আসে নাকি? পুরুষজাতকে অমন আস্কারা দিস নে—দিস নে। তা হলে কত হেনস্তা করবে, দেখে নিস।

যেন পুরুষের সঙ্গে ঘরকন্না করিয়া করিয়া বিভা মস্ত বড় গিন্নিঠাকরুন হইয়া গিয়াছে। উমারাণী হাসিয়া উঠিল।

সবাইকে তোর গোঁসাইঠাকুর ভাবিস নাকি?

তারপর টিপিটিপি হাসিতে হাসিতে বলিল, ভাল হয়েছে যে ঐদিন আমাকে বউ সেজে বসতে হবে না, বাসরঘরে নিমাই গোঁসাইর কাছে ভাগবত শোনা যাবে। রাগ করিস নে ভাই, আর একটা লোকও এসেছিল সেদিন—কিন্তু জালিয়াতি বুদ্ধি তার তো মাথায় আসে নি।

বলিতে বলিতে অকস্মাৎ উমার মুখ অপূর্ব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এক মুহূর্ত সে চুপ করিয়া রহিল, তারপর মৃদু স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, দাদু বলেন, দেবতা। আমার দাদুর মুখে যিনি হাসি ফুটিয়েছেন সত্যি তিনি দেবতা। তোর কাছে বলব কি ভাই, সকালে উঠে রোজ মনে মনে তাঁকে প্রণাম করি। সেদিনের কাণ্ড নিয়ে লোকে হাসাহাসি করে, আমি তা বুঝি। তবু আমি জানি, ভাগ্যিস গোঁসাইঠাকুর আমাকে পছন্দ করে বসেন নি।…কিছুতে বিশ্বাস হতে চায় না যে সত্যি সত্যি কোনদিন ঐ দেবতার পায়ে মাথা রাখতে পারব।

ছাতের প্রান্তে দুইজনে নিঃসীম মাঠের দিকে চাহিয়া চাহিয়া পরম মধুর আসন্ন সেই দিনগুলিকে লইয়া স্বপ্নের জাল বুনিয়া চলিল। শেষ

ফাল্গুনের মাঠ। শিমুলবনে এখনও সব ফুল ফোটে নাই, তালের মাথায় নূতন জটা পড়িতেছে, বৈঁচিগাছে লাল লাল ফুলের কুঁড়ি দেখা দিয়াছে। গাঙের দিক হইতে আকাশে মেঘের কোলে কোলে এক ঝাঁক সাদা পাখী উড়িয়া যাইতেছে। যেন শ্বেতপদ্মের মালা—কখনো দীর্ঘ হইতেছে, কখনো আঁকিয়া বাঁকিয়া সুতা ছিঁড়িয়া যাইতেছে। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তখনো দু-জনে বসিয়া আছে।

সেদিন বাড়ি ফিরিয়া সকল কাজকর্ম সারিয়া উমারাণী একেলা তার জানলাটিতে বসিল। বাহিরে ছোট্ট উলুক্ষেতের উপর ঝাপসা-ঝাপসা অন্ধকার। তাহারই সীমানা দিয়া সারবান্দি টেলিগ্রাফ-পোস্টগুলা। যেন রাত্রি জাগিয়া তাহারা সান্ত্রীর মতো রেল-লাইন পাহারা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। উমার মনের উপর তন্দ্রা চাপিয়া বসিল, বিয়ে যেন তার আজই। আলো জ্বালিয়া বাজনা বাজাইয়া বড় জাঁকজমক করিয়া স্টেশন হইতে বর তাদের বোধন-তলায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, চিৎকার কোলাহলে কান পাতা যায় না। বিভা মল বাজাইয়া ছুটিল বর দেখিতে। সে-ও ছুটিল। গুম করিয়া তার পিঠে বিভা দিল এক কিল।

যাচ্ছিস কোথা পোড়ারমুখি? বসে থাক্ পিঁড়ির উপর। এক দিনে লোভ মেটে নি? শুভদৃষ্টি হয়ে যাক, তারপর দেখিস যত খুশি—

অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক যুক্তি পরামর্শের পর ঠিক হইল, শুভকর্ম কিছুতে ফেলিয়া রাখা যাইবে না—যেমন করিয়া হোক, ঐ এগারোই একদিনে দুইটি সারিতে হইবে। ভুবন চৌধুরি অনেক মুন্সিয়ানা করিয়া একখানা চিঠি লিখিলেন। পড়িয়া দেখিয়া সদয়গোপাল খুব খুশি হইলেন।

কিন্তু নিশি রায় অবিচল। জবাব আসিল, জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি ছাড়া কোনক্রমে বিয়ে হইবার জো নাই। শ্রীমানের পরীক্ষার জন্য অসুবিধা তেমন নয়, দু-তিনটা দিনে এমন কি আর আসিয়া যাইবে! আসল কথা, এদিককার গোছগাছ সমস্ত হইয়া উঠিবে না। বাড়ির মধ্যে প্রথম ছেলে, অতএব—ইত্যাদি।

তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলে কাল্পনিক টাকা বাজাইয়া ভুবন চৌধুরি কথাটা পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

সদয়গোপাল আরও রুখিয়া উঠিলেন, এগারোই খুকির বিয়ে আমি দেবই। সুনীল কিচ্ছু জানে না, সে আমার ভোলানাথ। সমস্ত ঐ বুড়োর কারসাজি।

ইতিমধ্যে বৃত্তান্ত শুনিয়া একদিন কেদার মিত্র মহাশয় স্বয়ং চলিয়া আসিলেন। উপর্যুপরি শোক ও বিপদের অবধি নাই, কিন্তু সে সব সত্ত্বেও তিনি এক কথার মানুষ, ভদ্রলোকের উপকারার্থে ঐ এগারোই তারিখেই তিনি রাজি। মাথা নাড়িয়া পরম গম্ভীর ভাবে কেদার কহিলেন, নিশি রায়কে আমি জানি মশায়। দু-এক হাজারের কর্ম নয়। মিছেমিছি হয়রান হচ্ছেন, আমাকেও হয়রান করছেন।

দেখা যাক।

সদয়গোপাল ও ভুবন চৌধুরি যাত্রা করিলেন। এবং মন্ত্র বলেই নিশি রায়ের সমস্ত অসুবিধা দূর হইয়া গেল। আর কোন আপত্তি রহিল না। তারপর একদিন গ্রামের মেয়েরা আনন্দ-উৎসব সারিয়া যে যার বাড়ি চলিয়া গিয়াছে, সদয়গোপাল ভুবনের বৈঠকখানায় নিবিষ্ট মনে ফর্দ করিতে বসিয়াছেন, সেই সময়ে উমারাণী চুরি করিয়া দাদুর দেরাজ হইতে টাকার ছাপ-মারা চন্দন-মাখানো লগ্নপত্র টানিয়া

বাহির করিল। সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইল স্ট্যাম্প-আঁটা আর একখানি কাগজ।

•

এগারোই বৈশাখ পাশাপাশি দুই বাড়িতে পাল্লা দিয়া রসুনচৌকি বাজিতেছে। সদয়গোপালের স্ফূর্তির আর অবধি নাই। সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্নার যেন প্লাবন বহিয়া যাইতে লাগিল। ঘটিয়াছেও বেশ—দুইটা লগ্ন। উমারাণী বয়সে একটু বড, তার বিয়ে প্রথম লগ্নে হইবে। শেষের লগ্নে বিভার। ভুবনই বিবেচনা করিয়া এই রকম ব্যবস্থা করিয়াছেন। বরাসন এক জায়গাতেই—খাওয়া দাওয়া সমস্ত একত্র হইবে। সন্ধ্যার গাড়িতে দুই বর আসিবে। আলো জ্বালিয়া বাজনা বাজাইয়া সকলে স্টেশনে বর আনিতে গিয়াছে।

সর্বাঙ্গে অলঙ্কার ঝলমল করিয়া উমারাণী বসিয়া আছে। বিভা পলাইয়া আসিয়া পাশে বসিল। হাসিয়া হাসিয়া দু-জনে কি গল্প করিতেছে। এমনি সময় বাহির বাড়িতে আর্তনাদ। সদয়গোপাল ছুটিয়া আসিলেন। যেখানে তারা বসিয়া ছিল, সেইখানে আসিয়া উমার চুলের মুঠি ধরিয়া পিঁড়ি হইতে মাটিতে ফেলিলেন। নিজেও পড়িলেন। চিৎকার করিয়া উঠিলেন, হতভাগী—

•

বিহ্বল উমারাণী। বিভা কাঁদিয়া উঠিল। সদয়গোপাল আকাশ ফাটাইয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন, হতভাগী, এত লোকে মরে, তুই মরিস নে কেন? ঘেন্না করে না? গলায় দড়ি দিগে যা, কুয়ায় ঝাঁপ দিয়ে পড়গে যা। যা—যা—

বলিয়া সবলে তাহাকে ঠেলিয়া দিলেন।

বিভা আকুল হইয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল, কি হয়েছে দাদু? কি হয়েছে বলুন শিগগির—

আর কথা নাই। বৃদ্ধ সম্বিৎ হারাইয়া সেইখানে এলাইয়া পড়িয়াছেন। ভুবন চৌধুরি ছুটিয়া আসিয়াছেন, আরও কে কে আসিয়াছে। বিভা ঝাঁপাইয়া বাপের কোলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, কি হয়েছে? ও বাবা, কি হয়েছে বল আমায়।

ভুবন একবার উমারাণীর দিকে তাকাইলেন। পাষাণ প্রতিমার মতো স্থির নির্নিমেষ ভাবে সে বসিয়া আছে। বিভা বলিতে লাগিল, বলছ না কেন বাবা? বল, বল, পায়ে পড়ি তোমার—

ভুবন বলিলেন, সুনীল আসে নি। একলা প্রশান্ত—

একজনে প্রশ্ন করিল, গাড়ি ফেল করেছে?

না গো, সর্বনাশ করেছে। বিয়ের সওদা করতে নিজেই কলকাতা যায়। তারপর আর পাত্তা নেই। আজকে বাপের কাছে হঠাৎ এই টেলিগ্রাম। ওরা এনে দিল।

টেলিগ্রামখানা সকলে পড়িল। অংস্থা গাতকে সুনীল কলিকাতাতেই বিবাহ করিয়া বসিয়াছে। ঝোকের মাথায় একটা কথা দিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই হইতে ভাবিতে ভাবিতে সে পাগল হইয়া উঠিয়াছে। বাবা যেন তাকে ক্ষমা করেন। এবং উপসংহারে বাপকে আশ্বাস দিয়াছে, দু-এক দিনের মধ্যে তাঁর পুত্রবধূর মুখ দর্শন ঘটবে।

সদয়গোপাল চেতনা পাইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন, আমার কি হবে? ও বাবা ভুবন, কি উপায় হবে আমার? জাত গেল, মান ইজ্জত গেল। ঐ হতভাগী কালামুখী বাপ খেয়েছে, মা খেয়েছে, আমার জাত-কুল খেলে, আমাকে খেয়ে ফেললে।

যুবকের দল তখন ক্ষেপিয়া উঠিয়া চেঁচামেচি শুরু করিয়াছে।

বেইমান। আমরা তো তাকে দেখেছি, ঠিক চিনব। গাড়ি পাহারা

দেব, দেখি— বউ নিয়ে কবে যায়। হিড-হিড করে নামিয়ে আষ্টে-পিষ্টে জুতো—

সদয়গোপাল উঠিয়া আলো ও লাঠি হাতে লইলেন।

কোথায় যান ?

কেদারের কাছে। তার দয়ার শরীর—সে কথা ফেলবে না।

ভুবন চমকিয়া বলিলেন, কেদার মিস্তির ?

হ্যাঁ বাবা। এক্ষুনি যাব। আজ রাত্রের মধ্যেই ঐ আপদ বিদায় করব। তোমরা কেউ যাবে সঙ্গে ?

দু-একজন সঙ্গ লইল।

আশ্চর্য, উমারাণীর চোখে জল নাই। ধীরে ধীরে সেও উঠিয়া দাঁড়াইল। সেখানে তখন একেলা মাত্র বিভা। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কোথা যাচ্ছিস ?

উমারাণী সহজ কণ্ঠে বলিল, যাই—একটু ঘুমিয়ে নিগে। কেদার মিস্তিরের খুব দয়া, নিশ্চয় আসবেন। এলে উঠব তারপর—

আর একটি কথাও বলিল না। বিছানায় গিয়া পাশ ফিরিয়া সে শুইয়া পড়িল। বিভা ডাকাডাকি করিতে বলিল, ঘুমুই ভাই। তোরও লগ্ন একটু পরে। তুই যা।

হয়তো চুপি-চুপি কাঁদিয়া লজ্জা ও অপমানের ভার একটু লঘু করিবে। বিভা আর কিছু না বলিয়া উঠিল। তখন এ-বাড়ি একেবারে নিস্তব্ধ, উৎসবের বাজনা-কোলাহল সমস্ত থামিয়া গিয়াছে। এখানে-ওখানে মুখোমুখি দু-চার জন ফিস-ফিস করিয়া বোধ করি এই সব আলোচনাই করিতেছিল।

ঢং ঢং করিয়া ঘড়ি বাজিয়া যাইতেছে—নয়, সাড়ে নয়, দশ

মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা! কথাটা মনে করিয়া উমারাণীর বুকের মধ্যে আনন্দ যেন নাচিয়া উঠিল। ওরা ঠাট্টা করিয়াছে, টেলিগ্রাম মিথ্যা—তুমি নিশ্চয় আসিবে। কলিকাতা হইতে ঝলমলে বরের সজ্জা কিনিয়া রাজপুত্রের মতো তুমি আসিতেছে।...এগারোটার গাড়ির আর দেরি কত? দিগ্‌দিগন্ত ভেদ করিয়া বর লইয়া কলিকাতার গাড়ি ছুটিতেছে। কেদার মিস্তিরের আগেই পৌঁছিতে হইবে। এঞ্জিনের গতি দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতেছে—এক'শ মাইল, হাজার মাইল, দশ হাজার মাইল,.. হাউই যত জোরে আকাশে ওঠে, আকাশের উল্কা যত জোরে ছুটিয়া আসে—

সহসা উমারাণীর মনে হইল, শিয়রের ধারে আসিয়া চুপি চুপি আদর করিয়া বর ডাকিয়া উঠিল, উমারাণী—

জবাব সে দিবে না। উপুড় হইয়া জোর করিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িল। তোমার সঙ্গে কথা সে আজ কিছুতে কহিবে না। তুমি যাও—

তোমার পরীক্ষার পড়া নিয়ে থাক তুমি। গোছগাছ হয়তো সমস্ত এখনো হয়ে ওঠে নি। কেন এই পাড়াগাঁয়ের বনজঙ্গলে কষ্ট করে এলে? কেন কেন?...

দাদুর চোখের ঘুম গেছে কত দিন থেকে! আমার কিচ্ছু নয়, আমার বয়ে গেছে—আমি খুব ঘুমুই।...দাদু কি করেছে জান?

বর জিজ্ঞাসা করিল, কি?

এই বাড়িঘর সমস্ত বিক্রি করেছে ভুবন চৌধুরির কাছে। দলিল আর লগ্নপত্তোর একসঙ্গে দেরাজে ছিল। আমার দাদুকে ওরা পথে বের করে দেবে।

রাণী, উমারাণী!

মৃদু হাসিয়া, হাসিতে গিয়া মুখখানি রাঙা করিয়া দেবতার মতো পরম সুন্দর বর কত কাছে আসিয়া বসিয়াছে। চোখ মুছাইয়া দিয়া কোমল স্নেহে ধীরে ধীরে মাথাটি কোলের উপর লইল। কালের উপর লইয়া তারপর—

না, না, না। খুব চিনেছি তোমায়। সময় হল এতদিন পরে। তুমি যাও, তুমি যাও—

চুপচাপ। আর কিছু নাই। চমকিয়া উমারাণী উঠিয়া বসিল। চৌধুরি-বাড়ির কোলাহল অল্প অল্প কানে আসিতেছে। সে কান পাতিয়া রহিল। আবার যেন শুনিল, বৈচিবনের আবছায় হইতে সেই ডাক অতিশয় মৃদু হইয়া আসিতেছে—

রাণী, উমারাণী গো—

স্বপ্নাচ্ছন্ন কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইল দিগন্তবিসারী জ্যোৎস্নার সমুদ্রে নৈশবাতাস আজ তরঙ্গ তুলিয়াছে, তরঙ্গে তরঙ্গে সেই ডাক ক্ষীণ—ক্ষীণতর—অস্ফুটতম হইয়া দূর হইতে দূরে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। সুপারি-বনের ফাঁকে ফাঁকে শুকনা বিলের পাশ দিয়া, উলুক্ষেত পার হইয়া ডাক শুনিতে শুনিতে উমারাণী রেল-লাইনের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। যত দূর অবধি দেখা যায়, লোহার পাটি ঝিকমিক করিতেছে। অশ্রুর উৎস খুলিয়া আকুল হইয়া সেইখানে সে কাঁদিতে বসিল।

চৌধুরি-বাড়িতে ভারি গণ্ডগোল। বাজনা বাজিতেছে, বাজি পুড়িতেছে, লোকজনের হাঁকডাক। লগ্নের আর দেরি নাই। হঠাৎ এ বাড়িতেও রসুনচৌকি বাজিয়া উঠিল। কেদার মিত্র আসিলেন নিশ্চয়। দয়ার শরীর—পুত্রশোকের মধ্যেও পরের বিপদ অবহেলা করিতে পারেন নাই।

দুই চক্ষের সমস্ত দৃষ্টিশক্তি পুঞ্জিত করিয়া উমারাণী তখন দেখিতেছে, কোথায় রেলগাড়ি? দূরে—অনেক দূরে যেন একটুখানি আলোর মতো। লগ্ন যে আসিয়া গিয়াছে। গাড়ির এত দেরি।

বাড়ির মধ্যে খোঁজাখুঁজি পড়িয়া গিয়াছে। চাপাগলায় হাঁকডাক চলিয়াছে। সদাগোপাল অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন—কোথায় গেল খুকি, ওরে তোমরা দেখ দিকি একবার। লণ্ঠন লইয়া কারা যেন এদিকে আসিতেছে। আর উমার কাণ্ডজ্ঞান রহিল না, ধরিয়া ফেলিল বুঝি পাগল হইয়া লাইন ধরিয়া সে ছুটিল। খোয়া-তোলা পথ—দুইদিকে লোহার সীমানা। আঘাতে আঘাতে পা কাটিয়া রক্তের ধারা বহিল। তবু ছুটিয়াছে। যেদিক দিয়া কলকাতার গাড়ি আসে, উন্মাদিনীর মতো দুই ব্যাকুল বাহু সেদিকে প্রসারিত করিয়া সে কাঁদিতে লাগিল, তুমি এসো—এসো—আর কত দেরি করছ, এসো তুমি—

না, দেরি নাই আর। সহসা স্টেশনে সিগন্যালের ডগমগে লাল আলো সুনীল স্নিগ্ধ হইয়া চির-দুঃখিনী মেয়েটিকে অভয় দিল। সুতীব্র সার্চলাইটে চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া বিপুল সমারোহে বর আসিতেছে। তারপর কি হইয়া গেল, সকল দুঃখ ভুলিয়া পরম আরামে উমারাণী সেইখানে শুইয়া পড়িল। শুইয়া শুইয়া দেখিতে লাগিল, আলোর বন্যায় সমস্ত একাকার করিয়া গাড়ি ছুটিতেছে পৃথিবী কাঁপাইয়া রাত্রির নিঃশব্দতা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া হাজার হাজার মাইল বেগে যেন বড় আদরের আহ্বান ছুটিয়া আসিতেছে—

উমারাণী, উমারাণী!

সেই বন্ধুর রাস্তা, লোহার লাইন, অগ্নুদ্গারী প্রত্যাসন্ন এঞ্জিন একমুহূর্তে তার কাছে পরম মনোহর হইয়া উঠিল। নিশ্চিন্ত আলস্যে উমারাণী চোখ বুজিল।

জলতরঙ্গ

নূতন নূতন ঘর ও গোলা বাঁধা ত্রিলোচন দাসের এক নেশা। ঘরের আর অন্ত নাই, আনাচে-কানাচে সকল জায়গায় ঘর। পৈতৃক আমলের প্রশস্ত উঠান ইদানীং এক গোলকধাঁধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে—একবার ঢুকিয়া পড়িলে বাহির হইবার পথ পাওয়া দায়। আবার খুঁজিয়া পাতিয়া পথ নিতান্ত যদি মিলে, ত্রিলোচন অমনি আগলাইয়া আসিয়া দাঁড়াইবে। বলে, হুঁঃ, যাওয়া বললেই হল? ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলে নাকি? বোসো—বোসো—তামাক খাও—চান করে একসঙ্গে বসে দুটো শাকভাত খাওয়া যাবে। তারপর যেও।

ফুলকুমারী ত্রিলোচনের দ্বিতীয় পক্ষের বউ, বয়স বেশি নয়—ছেলেপুলে হয় নাই আজও। তা হইলে কি হয় সে ইতিমধ্যেই বিশ-পঁচিশটি শিশুর মা হইয়া মহা ভারিক্কি চালে চলিতে লাগিয়াছে। ত্রিলোচনের আগের সংসারের ছেলেমেয়ে দু'টি—হারাণ ছোট, সে তো রাত-দিন মায়ের পিছনে লাগিয়াই আছে, আর মেয়ে পটেশ্বরী—অতদূর নয় যদিচ—তবু খেলাধুলার ফাঁকে প্রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় একবার করিয়া তার মাকে দেখিয়া যাইতে হয়। ওদিকে ন'পিসীর দুই মেয়ে, রাণীর দু-বছরের খোকা একটি, সতুর মা, গোলাপী—ইহাদের সব ছেলেমেয়ে। শেষরাত হইতেই এঘরে ওঘরে দুই-এক করিয়া জাগিয়া উঠিয়া শিশুরা তাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতে শুরু করে। ঐ যে চলিল, সমস্ত দিন ও রাত্রি এক প্রহরের আগে তার বিরাম নাই।

মাঝে মাঝে খণ্ডযুদ্ধ চলে, ব্যাপার তুমুল হইয়া উঠিলে ফুলকুমারীকে রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া পড়িতে হয়।

সে-বার কি-একটা যোগ' ছিল, পাড়া ভাঙিয়া মেয়েপুরুষ সব কলিকাতায় গঙ্গাস্নানে চলিয়াছে। সকালবেলা কি কাজে ত্রিলোচন ঘরে আসিয়াছে, ফুলকুমারী চট করিয়া ঢুকিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল। রান্না করিতেছিল, আগুনের তাপে মুখ লাল। একটু হাসিয়া বলিল, একটা কথা বলব ?

কি ?

রাখ তো বলি। নইলে মিছিমিছি—

তারপর স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া চোখ বড় বড় করিয়া কৌতুক-ভরা স্বরে কহিল, বল দি'কি কেমন ! যদি বলতে পার বুঝব তবে—

ত্রিলোচন গবেষণা করিয়া কহিল, কাঁচা লঙ্কা এনে দিতে হবে বোধ হয়।

ঐ তোমার কথা। তোমার কেবল সংসার সর্বস্ব। বধূ খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। একটু পরে গম্ভীর হইয়া বলিল, দেখ, সংসারের কচকচি নিয়ে আছি তো রাতদিন। পরকালের একটু কাজ করে আসি। মোক্ষদা-দিদি বলছিল, বউ, চল্ না কেন, একটা ডুব দিয়ে আসবি।

ত্রিলোচন কহিল, খুব একটা সহজ বুদ্ধি বলে দিতে পারি।

ফুলকুমারী উৎসুক চোখে চাহিয়া আছে। ত্রিলোচন বলিতে লাগিল, একটা ডুব বইতো নয় ? যোগের দিন 'জয়গঙ্গা' বলে এই দুধমতীতেই নেমে পোড়ো। কোথাও যেতে হবে না, কোন হাঙ্গাম পোয়াতে হবে না···ওই ভাল—

বধূ বলে, ঐ নোনা গাঙ হল তোমার গঙ্গা ?

'শত যোজন দূরে থাকি যদি গঙ্গা বলে ডাকি –' ভুলে গেছ শিশুবোধকের কথা? নোনা গাঙ—তা কি হয়েছে! বলিতে বলিতে ত্রিলোচনের কণ্ঠ গভীর হইয়া উঠিল। বলিতে লাগিল, হলস বা নোনা গাঙ—তিন সন্ধ্যে আমাদের অন্ন যোগাচ্ছে। দেখে এসোগে একবার ঐ কুশখালি-ন'হাটা অঞ্চলে। এক কোশ দু-কোশ সব মাঠ পড়ে রয়েছে—এক চিটে ধান নেই—বর্ষায় অথই জলে তলিয়ে থাকে। গাঙ নেই, তাই জল নিকেশ হয় না। বউ, ঐ দুধমতী আমাদের গঙ্গা—মা গঙ্গা—খাইয়ে দাইয়ে বাঁচিয়ে রাখছে। ওকে ঘেন্না কোরো না।

ফুলকুমারী মুখ ঘুরাইয়া বলে. তাই বলছি বুঝি? খালি কথা ঘোরানো তোমার। আমি ওদের সঙ্গে যাব কলকাতা। দুটো ভাল-মন্দ দেখব শুনব—একটু হাঁপ ছেড়ে বেড়াব। রাত-দিন হাঁড়ি-বেড়ি ঠেলতে পারি নে তোমার।

আয়োজন চলিতে লাগিল। ফুলকুমারীর স্ফূর্তির অবধি নাই। কাজের একটু ফাঁক পাইলেই এটা-সেটা গোছাইয়া মোট বাঁধে। মোটঘাটের পাহাড় হইতে লাগিল। রকম দেখিয়া ত্রিলোচন কহিল, ব্যাপার কি বউ? পুরোদস্তুর একটা সংসার নিয়ে চলেছ—পাকাপাকি গঙ্গাবাস করবার মতলব নাকি?

ফুলকুমারী কথা গায় পড়িতে দিবার মেয়ে নয়। বলিল, মন্দ কি? সংসার স্বামী, ছেলেপুলে—সমস্ত সাধ তো ভগবান পুরোলেন। আমার মতো ভাগ্যি কার? এসো না, বুড়োবুড়ি দু-জনে গঙ্গাতীরে থেকে পরকালের কাজ করি গে—

ত্রিলোচন সভয়ে চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল, মা গঙ্গা মাথায় থাকুন। বাপ রে বাপ। অঘ্রাণ মাসে পিসির বাড়ি গিয়ে শেষে একটা বেলাতেই পাগল হয়ে যাই আর কি চারিদিক চুপচাপ, কি

রকম যেন—মনে হচ্ছিল, কে যেন বুকের উপর বিশমনি পাথর চাপিয়েছে।

ফুলকুমারী যেন কত মুরুব্বি মানুষ। তেমনি ভাবে কহিল, সত্যি—বড্ড বেশি মায়া তোমার। আমি তো অবাক হয়ে যাই। দুপুরবেলা নন্দ এসে চুল টানবে, পটু বুকের উপর ঝাঁপাবে, খোকা আগডুম বাগডুম বকবে, তিন্টু টুনি সব দল বেঁধে ঘরের মধ্যে কানামাছি শুরু করবে, তবে বাবুর ঘুম আসবে। আচ্ছা এক অভ্যেস করেছ কিন্তু—

ত্রিলোচন কহিল, ও বিষয়ে তুমি একেবারে পরমহংস—মায়ামমতা মোটে নেই। সবাই কি অমন পারে? কিন্তু বউ, তা যেন হল। তোমার নন্দ পটু ওদের চুল টেনে কি আগডুম-বাগডুম বকে সত্যি সত্যি তো পেট ভরবে না। তার ব্যবস্থা কি করে যাবে শুনি?

একটা কিছু হবে নিশ্চয়। বালয়া বধূ আড়চোখে চাহিয়া স্বামীর মুখভাবটা দেখে, আর মুখ টিপিয়া হাসে। বলে তুমি রইলে কি করতে তবে? ওদের খাওয়াবে, নাওয়াবে, নিয়ে শোবে—আর—আর ঘেন্না করলে ছেলে মানুষ করা যায় না গো—সমস্ত করতে হবে। আর শুনে নাও ভাল করে। পটুর সর্দি করেছে, ওর ভাত বন্ধ—যদ্দিন না সারে, দুধ-সাগু। হারাণ পেটরোগা, ওর দুধে জল মিশিয়ে দিও। নন্দর একবেলা ভাত, একবেলা খই। মাছ-টাছ গুচ্ছেরখানেক কাউকে না দেয়—বায়না ধরলে, খুব কসে তাড়া দিও। সমস্ত মনে থাকবে তো? কি বল?

ত্রিলোচন মহা উৎসাহে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, খুব খুব! এ আর বেশি কথা কি? হারাণের দুধ-খই, নন্দর দুধ-সাগু, পটু মাছ খাবে না··· সে সব ঠিক আছে, কিছু ভেব না বউ। কিন্তু রাত পোহালে তোমার বাড়িতে আরও খানপঞ্চাশেক পাতা পড়ে, তাদেরওাক ঐরকম ব্যবস্থা?

ফুলকুমারী হাসি চাপিয়া বলিল, ঠিক ঐ রকম। যাক দুর্ভাবনা ঘুচল আমার।

ত্রিলোচন কহিল, কিন্তু আমার ঘুচবে না। আমায় ফেলে গেলে রাত-দিন এমন বসে বসে ভাবব—পথ তো মোটে সুবিধের নয় কিনা··· খাল দিয়ে, গাঙ দিয়ে, রেলগাড়ি দিয়ে—বিচ্ছিরি!

মুখ ঘুরাইয়া বধূ বলিল, ওঃ, ভাবনার কি পার আছে? গাঙের পথ স্টেশন অবধি। আর রেলগাড়িতে পুরো একটা বেলাও লাগে না—

ত্রিলোচন বলিতে লাগিল, আহা, খবর তো রাখ না। দুধমতীতে নতুন পুল হয়েছে—গুমগুম করে গাড়ি তার ওপর দিয়ে চলে যাবে। ঝুপ করে তোমার গাড়িখানা যদি ছিঁড়ে পড়ে গাঙের জলে। কিংবা বর তুমিই যদি গাড়ির জানলা দিয়ে যাও পড়ে—

বধূ কিন্তু ভয় পায় না, ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলে। বলে, মুশকিল তা হলে তোমার বটে। আবার ছাদনাতলায় গিয়ে নতুন শালা-শালাজের ঠোনা খেতে হবে। না?

বলিয়া তাকাইয়া থাকে। আবার বলিয়া ওঠে, সে ভয় নেই গো। পড়ি তো ডুবব না কিছুতে, ভেসে উঠব। দুধমতী মেয়েমানুষ—আমিও। সে আসবে মেয়েমানুষের সঙ্গে লাগতে—ভয় নেই মনে মনে?

একটা মজার গল্প এ অঞ্চলের ঝি-বউ বলা কওয়া করিয়া থাকে। গল্পটা নদীর ঐ পুলের সম্বন্ধে। সত্য হইলে, মেয়েমানুষ সম্পর্কে দুধমতীর ভয় থাকিবার কথাই বটে। লোহালক্কড়ের জালে আবদ্ধ নদী, বুকের উপর সেতুর জগদ্দল পাথর লইয়া এই বছরখানেকের মধ্যেই তার উদ্দাম তরঙ্গ বেশ শান্ত ও ভদ্রতাসঙ্গত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ জলের বেগ কমাইতে কোম্পানি বাহাদুর জলের মতো টাকা ঢালিয়াছেন। কত

লোকজন আসিয়াছিল, এপার-ওপার ছাউনি করিয়াছিল, ছোটসাহেব বড়সাহেব কত আসিল, তাদের ক্লান্তিহীন অবিরাম চেষ্টা দুধমতী বুদ্বুদের মতো একটি কলমি-ডগার এতো তীরবর্তী অসহায় বাবলা-শিশুগুলার মতো অবহেলায় ডুবাইয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইত। শেষে তো কোম্পানি রাগিয়া খুন···সাহেবের চাকরি থাকে না এমনি গতিক। হঠাৎ একদিন মেমসাহেব আসিয়া হাজির। গাছ-কোমর বাঁধিয়া মেঃসাহেব নদীর পাড়ে কোন্দল করিতে আসিল, দেখি দুধমতী, তোর আস্পর্ধা কেমন! আমার বরের চাকরি খাবি? মেমসাহেব নিজে সাহেবের পাশে থাকিয়া লোহালক্কড় বসাইতে লাগিল। দুধমতী সেই হইতে এতটুকু। গাঙ বাঁধা হইয়া গেল মেয়েমানুষকে পুরুষে জব্দ করে করিতে পারিয়াছে? মেয়ে নইলে হয় না ওসব।

রওনা হইবরে আগের দিন খুব রাগ করিয়া আসিয়া ফুলকুমারী বলিল, ডিঙি তোমায় কে ঠিক করতে বলেছে শুনি?

নির্বিকার কণ্ঠে ত্রিলোচন বলিল, ভেবেছিলাম, সত্যি সত্যি যাবে বুঝি। না যাও তো বল, মানা করে পাঠাই—

ফুলকুমারী কহিল, হ্যাঁ, ডিঙি মানা করে বড় দেখে পানশি ভাড়া কর গে। নন্দ যাবে, পটু যাবে, হারাণও যাবে···শোন একটা মজার কথা—কাল ন-পিসি এমনি একবার হারাণকে বলেছে, তোকে নিয়ে যাবে না কলকাতায়—ছেলের সেই থেকে মুখের ভাব যদি দেখ! কিছুতে শান্ত করতে পারি নে—

তিনু, টুনি, সন্তু—ওরাই বা দোষ করল কি বউ? ওদের নেবে না?

মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া বধূ কহিল, তাই তো ভাবছি। রাতদিন

যা করে বেড়ায়—আমি টিকটিক করে মরি। না নিয়ে গেলে দেখবে কে? তোমার হাতে দিয়ে যাব ভেবেছ?

ত্রিলোচন হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমিও তাই বলি বলি বউ, হয় দলসুদ্ধ রওনা হও—নয়তো আর দিনকতক সবুর কর, ছেলেপিলে তোমার বড় হোক। কিন্তু যে রকম সব শান্তশিষ্ট—দলসুদ্ধ নিয়ে পথে ঘাটে সামলাতে পারবে তো?

ফুলকুমারী রাগিয়া উঠিল। বলিল, আমার বয়ে গেছে। আমি যাব তীর্থ করতে, সঙ্গে পল্টন নিয়ে যাব! তার আমার ইয়েরা কিনা, একটাকেও নেব না।

দ্রুতপদে সে চলিয়া গেল। রাত্রে ত্রিলোচন আসিয়া খবর দিল, এই মস্ত বড় পানসি, একেবারে চার টাকা আগাম দিয়ে এলাম। তোমাদের সবাইকে স্বচ্ছন্দে ধরে যাবে বউ—

ফুলকুমারীর তবু আপত্তি। বলে, উমাপদর সঙ্গে যাচ্ছি না তা বলে। ছেলেপিলে নিয়ে ও বলে নিজেই এক ছেলেমানুষ। তোমাকে যেতে হবে।

ত্রিলোচন স্বীকার করিল, আচ্ছা।

ফুলকুমারী তবু ভাবিতে লাগিল। বলিল, সকালে উঠে তিনু সন্তুকে গরম মুড়ি ভেজে দিই, নন্দ মুড়ি খায় না, খালি দুধ। তোমার কলকাতায় দুধ-মুড়ি পাওয়া যায় তো?

ত্রিলোচন কহিল, যায় বোধ হয়।

ফুলকুমারী কহিল, আন্দাজি বললে ছেলেপিলে নিয়ে যাই কোন ভরসায়? তুমি একটু খবরও নিতে পার নি? আবার মুশকিল এমনি, পটুটার সর্দি কিছুতে যাচ্ছে না। রাস্তাঘাটে ঠাণ্ডা না লাগে।

ত্রিলোচন বলিল, গরম কাপড় গায়ে থাকবে। আর ঠাণ্ডা একটু-

আধটু লাগলেই বা কি হচ্ছে? সমস্ত ঠিকঠাক, পানসির চার টাকা বায়নাও দেওয়া হয়ে গেছে—

ফুলকুমারী আগুন হইয়া উঠিল। টাকাটা দেওয়া হয়েছে তো কি হয়েছে? টাকার জন্যে ছেলেপিলে বিসর্জন দিয়ে আসতে পারি নে। পানসি মানা করে লোক পাঠাও যায় টাকা, যাক গে।

ত্রিলোচন ইতস্তত করিয়া কহিল, সেটা কি ঠিক হবে বউ? বিবেচনা ক'রে দেখ—চার চারটে টাকা। ও তো ফেরৎ দেবে না।

আরও অধীর হইয়া ফুলকুমারী বলিল, টাকা আমি হাতের বাউটি বেচে দেব। আমি যাব না, মানা করে পাঠাও। আর না পার তো বল, গোবিন্দকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

গোবিন্দ খুঁজে পাবে না।

কেন? ঘাটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে।

ত্রিলোচন মাথা চুলকাইয়া বলিল, ঘাটে পানসি একখানাও নেই—

ফুলকুমারী কহিল, তাই বলি। পানসি হয়েছে—হেনো হয়েছে—তেনো হয়েছে—মিছিমিছি আমায় শাসিয়ে আসছ। আমি যাব, আর পয়সা খরচ করে তুমি করবে পানসি-ভাড়া? আ আমার কপাল! তোমার পরাণ-জেলের ঐ নড়বড়ে বিনি-পয়সার ডিঙি বলে রেখেছ নিশ্চয়। ও তে আমি যাব না, কখখনো যাব না—এই বলে দিলাম।

অপরাধীর ভাবে ত্রিলোচন কহিল, তা ও হয়ে ওঠে নি বউ। পরাণ মাছ ধরতে নাবালে চলে গেছে

জানি—জানি। এবার বধূ রাগিয়া উঠিল, আমি কোথাও যাই, সে কি তোমার ইচ্ছে? আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছ।

ত্রিলোচন বলিল, তোমাকেও জানি তো। বায়না দিয়ে অনর্থক

টাকা নষ্ট করব কেন? বেশ তো বউ, গঙ্গা শুকিয়ে যাচ্ছে না—ছেলেপিলে বড় হোক, তখন আমরা পুণ্যি করতে যাব।

নিশ্বাস ফেলিয়া বধূ কহিল, সে আর পোড়া অদৃষ্টে আছে! পায়ের এক-শ গণ্ডা বেড়ি। আমিও এই বললাম, মরুক বাঁচুক—মারামারি করে মরে যদি সবগুলো, আমি আজ থেকে তাকিয়েও দেখব না। সবাই সগ্‌গে বাতি দেবেন কি না!

বাড়ির দক্ষিণে পুকুর ও নারিকেল-বাগান, তারপর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা, তার ওদিকে দিগন্তবিসারী বিল। ঐ বিলের মধ্যে ত্রিলোচনের জোতজমি সমস্ত। বিলের এক দিকে ভুবমতী, আর এক দিকে খাল। বেশ চলিতেছিল, হঠাৎ ঐ খালের গতিকে সব উল্টা হইয়া দাঁড়াইল। খালের কি হইল, মানুষের সঙ্গে যেন আড়ি দিতে লাগিয়া গেল। আষাঢ়-শ্রাবণে ধান দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়, শ্যামল চিক্কণ বড় বড় গোছা··· যেদিকে তাকাও বিলের কোনখানে ফাঁক নাই। কোটালের মুখে হঠাৎ এক সাংঘাতিক খবর পাওয়া গেল, খালের জল অসম্ভব রকম বাড়িয়াছে, সেদিকের বাঁধ কিছুতে বাধা যাইতেছে না। খালের পার্শ্বে পেরেক-আঁটা জারুল কাঠের প্রকাণ্ড কবাট ফেলা থাকে, বর্ষার জলে বিল বেশি ভরিয়া গেলে, ভাঁটার সময় কবাট তুলিয়া দেওয়া হয়। বাড়তি জল সরিয়া গিয়া ধানের মাথা জাগিয়া ওঠে। বছরের পর বছর খাল এমনি করিয়া বিলের জল ভুবমতীতে বহিয়া দিতেছে। হঠাৎ সে যে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া বিদ্রোহ করিয়া বসিবে, এ অঞ্চলের দশটা গ্রামের লোক এমন কথা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবে নাই।

ত্রিলোচন ছুটিয়া জমিদারের কাছারি চলিল। প্রজাপাটক সকলেই ছুটাছুটি লাগাইয়াছে। খবর মিথ্যা নয়। নায়েব কাছারিতে নাই,

খালের ধারে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাঁধে মাটি ফেলার তদারক করিতেছেন। এদিকে বিলের জল ওদিকে খালের জল বাঁধের গায়ে ছলছল করিয়া আঘাত করিতেছে, সুবিপুল জলরাশির মধ্যে সামান্য একটি রেখার মাত্র ব্যবধান। কাছাকাছি মাটি কোথাও নাই, অনেক দূর গ্রামের দিক হইতে মাটি কাটিয়া নৌকা বোঝাই করিয়া বাঁধে ফেলা হইতেছে। দিন ভর জলকাদার মধ্যে নায়েবের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ত্রিলোচন বাড়ি ফিরিল। গভীর ঘুম আসিয়াছিল, রাত্রের খবর কিছুই জানে না। সকালে উঠিয়া দেখে, নারিকেল-বাগানে জল। পুকুর ডুবাইয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার উপর দিয়া জলস্রোত একেবারে বাহিরের উঠান অবধি ধাওয়া করিয়াছে। বাঁধের কোথাও চিহ্নমাত্র নাই, বন্যার জলে সমস্ত একাকার।

ক্ষেতে সে বছর এক চিটাও মিলিল না। বছর ঘুরিতে পঞ্চম গোলাটার তলা অবধি নিঃশেষ হইল। জমিদারের তরফ হইতে চেষ্টার ত্রুটি নাই। খাল হইতে রশি দুই সরিয়া আসিয়া পর পর দুই সারি নূতন করিয়া বাঁধ দেওয়া হইল। ফসলও হইয়াছে মন্দ নয়। কিন্তু বর্ষার মাঝামাঝি আবার সেই বিপদ। বাঁধ ভাসিয়া ক্ষেতের মধ্যে নোনাজলের তুফান ওঠে। তারপর জল সরিতে আরম্ভ করে, ধানের চারাও লাল হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। নায়েব নিশ্বাস ফেলিয়া বলেন, সমস্ত কলিকালের ফল রে বাবা—বামুন কায়েত কৈবর্ত সব এক মাদুরে বসে হুঁকো টানছে—এক বেঞ্চিতে রেলগাড়ি চেপে কাঁহা কাঁহা মুল্লুক করে বেড়াচ্ছে—হবে না? আরও কত হবে!

তা বলিয়া খাজনা মাপ হয় না—নায়েব হাঁ-হাঁ করিয়া ওঠেন। কথা বোলো না বাবাহে, ও কি একটা কথার মতো কথা? মালেকের মাল খাজনা—বলি, বিঘেয় যখন তিন কাহন করে ফলত, খাজনা কি

তখন বেশি দিতে? বরঞ্চ দুঁ-দশ দিনের সময়···কিন্তু তা-ও তো—ঐ কিস্তটিও বড সহজ নহে, কিস্তর সমস্যা মিটাইতে সিকি বছরের খাজনা চলিয়া যায়। তাই করিয়া কেহ কেহ কিছু সময় লইল। ত্রিলোচনের গোলার তলায় তখনও ধান আছে। রাগে রাগে বাডি ফিরিয়া গিয়া ব্যাপারি ডাকিয়া সে গোলার চাবি খুলিয়া দিল। খাজনা শোধ হইল এক রকম।

বনবিবিতলা বাঁধেব ভিতর দিকে। ভারি জাগ্রত দেবতা। গ্রামসুদ্ধ সকলে মিলিয়া বনবিবির পূজা দিল, ঢাকঢোল বাজিল, অনেক পাঁঠা পডিল। কিন্তু বনবিবি ঠেকাইতে পারিলেন না। খাল একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছে। মানুষে গাঙ বাঁধিযা ফেলিয়াছে, দুধমতী বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে দিন দিন, ওদিকে পারিল না, খাল এখন সেই আক্রোশে কূল ভাঙিয়া, ধানবন ডুবাইয়া প্রমত্ত তরঙ্গাঘাতে এই দিক দিয়া প্রতিহিংসা লইতে লাগিযাছে। পরের কোটালে দেখা গেল বনবিবিতলাতেই নৌকা চলিবাব মতো হইয়াছে, টিলার উপবে হাতখানেক জলের কম নয়, দেবতার স্থান বলিয়াও খাল একটু খাতির রাখে নাই।

স্বয়ং বুডা জমিদার চলিয়া আসিলেন। সঙ্গে সাহেবি পোষাক-পরা এক জন লোক। লোকটি গাঙের ধারে ধারে ক-দিন খুব ঘোরাঘুরি কবিল। শেষে ঘাড নাডিয়া রায় দিল, উপায় নাই। পুলে দুধমতীর স্রোত আটকাইয়াছে, স্রোত এখন খালের মুখে চলিয়াছে, খাল বড নদী হইয়া যাইবে।

কর্তা বলিলেন, কোন উপায় নেই?

সাহেব ভাবিয়া-চিন্তিয়া কহিল, খালের মুখে বাঁধ-দিয়ে একদম খাল বন্ধ করে দিতে পারলে হয়। তা হলে ওপারে সুঁটকির খালের দিক দিয়ে স্রোত ঘুরে যেতে পাবে।

সে কি সহজ কথা ?

সাহেব ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সহজ মোটেই নয়। কাঁচা বাঁধ দিয়ে আগে জল আটকাতে হবে। শেষে চাই কি—বিশ-ত্রিশটা জয়েন্ট বসিয়ে একদম সিমেণ্টের গাঁথনি···তা-ও এখন নয়, এখন ঠিক করে বলাও যাচ্ছে না কিছু। শীতকালের দিকে জল খুব কমে যাবে, তখনকার কথা—

সে যে লাখ টাকার ফের। প্রজাপাটক নিশ্বাস নিরুদ্ধ করিয়া আলোচনা শুনিতেছিল, তাহাদের দিকে ফিরিয়া হতাশ ভাবে কর্তা বলিলেন, শুনলে তো সকলে ? উপায় নেই।

সন্ধ্যা গড়াইয়া গেল। একে একে সকলেই চলিয়া গিয়াছে, আছে একা ত্রিলোচন। ত্রিলোচন নাছোড়বান্দা হইয়া বসিল, উপায় আমার একটা করে দিতেই হবে। কর্তার পা ধরিতে যায়। মাতব্বর প্রজা বলিয়া সকলেই তাকে জানে, এ অঞ্চলের মধ্যে কত বড় মানী ঘর ! কর্তা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ত্রিলোচন বলিতে লাগিল, আপনার এলাকায় আমার তিন-পুরুষে দু-শ বিঘে খামার জমি, তার উপর নিজে সে-বার আঠাশ শ দিয়ে আঠাশ বিঘে নিয়েছি।···আপনার জমি আপনার থাকুক কর্তা, আর পারছি নে—আমি এবার অব্যাহতি চাই। গোলা খা-খা করছে, গাঁটের পয়সা গুণে কাঁদাতে, খাজনা টেনে বেড়াই ?

আট-দশ দিন ঘোরাঘুরি করিয়া সমস্ত জমাজমি ইস্তফা দিয়া ত্রিলোচন নির্ঝঞ্ঝাট হইয়া বসিল। বাড়িতে ইদানীং মানুষজনের ভিড় নাই, রাণী ও-বছর শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, তার ছেলেমেয়ে সব গিয়াছে, সেই হইতে খবরবাদও সে বিশেষ কিছু দেয় না···গোলাপি গিয়াছে, টুনিরাও গিয়াছে ; অতগুলা ঘর, সমস্ত মাকড়শার জাল আর ইঁদুরের

গর্তে ভর্তি, দিন অন্তর সব ঘরে এক বার করিয়া ঝাঁটা দিবারও লোক নাই। বাহিরের লোকের মধ্যে রহিয়াছে এক মোক্ষদা। ত্রিলোচন বাড়ি আসিয়া চুপচাপ দাওয়ায় পা ঝুলাইয়া বসিল।

হঠাৎ মোক্ষদাকে দেখিয়া এক ধরনের হাসি হাসিয়া বলিল, সবাই সরে পড়ল। তুমি যে বড় এখনও রয়ে গেছ মোক্ষদা-দিদি, তোমায় নিতে আসবে কবে?

ম্লানমুখে মোক্ষদা কহিল, কোন্ চুলোয় কে আছে যে নিতে আসবে? যদ্দিন আছি, আমায় আশ্রয় দিয়ে রেখো—আমার ঠাঁই নেই।

ঘাড় নাড়িয়া ত্রিলোচন কহিল, বেশ, বেশ! কিন্তু একাদশী মাসে আর জুটোয় চলবে না দিদি, তা বলে দিচ্ছি। আমরাও আরম্ভ করব। পাল্লা দিয়ে এবার একাদশী চলবে।

কোথায় ছিল পটেশ্বরী, সাড়া পাইয়া বাবা বাবা—করিয়া ঝাঁপাইয়া আসিয়া পড়িল। আদুরে মেয়ে। বলিল, তামাক খাবি বাবা?

ত্রিলোচন হাসিয়া কহিল, আন্ দিকি কেমন।

মেয়ে বলিল, আচ্ছা।

ঘরের মধ্যে গেল, আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, এই নে। খালি হাত। হাসিয়া ত্রিলোচন তার হাত হইতে মিছামিছি হুঁকা লইল।

পটেশ্বরী কহিল, আর কি নিবি?

এবারে তেল আন খুকু। নাইতে যাব।

এই নাও। হাত উপুড় করিয়া খুকী বাপের হাতের উপর রাখিল। বলিল, মাখিয়ে দিই?

কচি কচি হাত দু'খানি বাপের বুকে-পিঠে বুলায়। ফুলের মতো নরম হাত। ত্রিলোচন আদর করিয়া মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইল। ফুলকুমারী কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে আসিল। সত্যকার ধোঁয়া

উড়িতেছে, খুকীর মতো মিছামিছি নয়—ত্রিলোচন চোখ বুজিয়া তামাক টানিতে লাগিল। হাসিমুখে ফুলকুমারী বাপের কোলে মেয়ে দেখিতে লাগিল।

পটেশ্বরী বলিল, আমায় দিবি নে বাবা ?

যেন চমক ভাঙ্গিয়া ত্রিলোচন চোখ খুলিল। বলিল, কি দেব মা ? তামাক ?

মেয়ে মুখ বাঁকাইয়া বলিল, উঁহু ! তামাক বুঝি ভাল—তামাক ছাই। হাত পাতিয়া ধরিয়া বলিল, তুই ভাত দে, ডাল দে—এই এখানে।

ত্রিলোচন ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সে দেওয়ার দিন যে ফুরিয়ে এল মা। ফুলকুমারী দেখিল, স্বামীর দু-চোখ দিয়া অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। হঠাৎ ত্রিলোচন তার দিকে চাহিয়া বলিল, শুনেছ বউ, জমি দিয়ে এলাম—

কাকে ?

দুধমতীকে, এত আক্রোশ হয়েছে যাঁর। তারপর কান্নারই মতো হাসি হাসিয়া বলিল, মোক্ষদা-দিদির কাছে একাদশীর খবর নিচ্ছিলাম। তুমি সধবামানুষ, স্বামীর সঙ্গে মিলে মিশে একাদশী করলে খুব পুণ্যি হবে। পাঁজিতে আছে দেখো। এবারে পাল্লা দিয়ে পুণ্যি করা যাবে। ধান তোমার আর ক-খু চি আছে বউ ?

বধূ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। হঃ, আমার ঘরসংসারের কুচ্ছো করতে আসেন। ভয়ানক ঝগড়া হয়ে যাবে কিন্তু। বলি, চান-টান করবে না আজ ? বেলা হয় না ? আমারই যে খিদে পেয়ে গেল।

ফুলকুমারীর কিন্তু মনে মনে ভয় হইয়া গেল। এতটা বয়স খাটিয়া-খুটিয়া যা-কিছু করিয়াছিল, সর্বস্ব দিয়া ও-বছর আঠাশ বিঘা জমি

লইয়াছে। সেই নূতন জমি এবং পৈতৃক খামার-জমি—এ সব লইয়া ত্রিলোচনের আশা-ভরসার অন্ত ছিল না, সমস্ত চুকাইয়া দিয়া সে যেন এক এক দিনে দশ বৎসর বুড়া হইয়া যাইতে লাগিল। সমস্ত দিন বসিয়া বসিয়া তামাক টানে। আর বেড়াইতে যায় তো খালের ধারে—লোকালয়ের ত্রিসীমানায় নয়। গতিক দেখিয়া ফুলকুমারী কহিল, নিত্যি নিত্যি খালে গিয়া কি হয়?

পা ধুতে যাই।

এই এক কোশ পথ হেঁটে পা ধোওয়া, পায়ের তো শখ কম নয়। কেন, গ্রামের মধ্যে কি জল মেলে না?

ত্রিলোচন বলে, বউ, দু-একটা কথাবার্তাও হয় খালের সঙ্গে। বলি—রাক্ষুসী, সর্বস্ব গ্রাস করে তো আছিস, কবে ফিরিয়ে দিবি, তাই বল। তারপর রাগ হয়ে যায়। খালের মুখে লাথি মেরে ফিরে আসি।

একদিন বধূ বড় ধরিয়া বসিল, দেখ এক কাজ করলে হয়—

উঁহু, কিছু করব না। ফুলকুমারী চুপ করিয়া গেল, ত্রিলোচন কিন্তু সপ্তমে চড়িয়া উঠিল। বলিতে লাগিল, কেন কাজ করব? চিরটা কাল কেবল কাজ আর কাজ। আর কিছু পারব না। বয়স বাড়ছে না কমছে?

হারাণ উঠানের উপর পেয়ারাতলায় হামাগুড়ি দিতে দিতে থাবা ভরিয়া পেয়ারা-পাতা মুখে পুরিল। ত্রিলোচন কহিল, দেখ, দেখ—কি খায় আবার··দেখ না গো—

খোকা কি সহজ ধন! আঁকিয়া-বাঁকিয়া পলাইতে চেষ্টা করে। তারপর হাতে-নাতে ত্রিলোচন ধরিয়া ফেলিল তো মাথা নাড়িয়া কিছুতে মুখে হাত দিতে দিবে না।

বড় দুষ্ট ছেলে…মুখ তোল্, এই খোকা তোল্ মুখ, দেখি—

দুষ্ট ছেলে মিটিমিটি হাসে, তার পরে হাসিমুখে দাঁতে দাঁত চাপিয়া মুখ ঘুরায় আর বলে, নেই· নেই, নেই—

সংসার চলে। কি করিয়া চলে, সে জানেন অন্তর্যামী। আর জানে ফুলকুমারী। সে যে কোথা দিয়া কি করে—তার সংসারের খবর সে কাহাকেও বলিবে না। বছর ঘুরিয়া আসিল, অগ্রহায়ণ মাস। উঠান ফাঁকা, ধানের গাদা নাই, গোটা গ্রামের মধ্যেই ধান-পোয়ালের সম্পর্ক নাই। ত্রিলোচন দাওযায় বসিয়া বসিয়া তামাক খায় আর ভাবে। এই সময়ে একদিন ফুলকুমারী বলিল, দেখ, আমার কথা শোন, গোলা খা-খা করছে—ধান নিয়ে এস দিকি কতগুলো—

ঠাট্টা করিতেছে নাকি? খোঁচাইয়া পুরাণো স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়া তার লাভ কি? স্ত্রীর দিকে সে চাহিয়া দেখিল। চাহিলে আজকাল বড় কষ্ট হয় মনে। সর্বাঙ্গ নিরাভরণ, চোখে কালিব রেখা পড়িয়াছে, মুখের হাসি কিন্তু নিভে নাই। ফুলকুমারী বলিতে লাগিল, উপায় আমি বলে দিচ্ছি। কিছু খাটনি নেই। শোন আমার কথা—

ত্রিলোচন ধরা গলায় কহিল, খাটনি কি আমি ভয় করি বউ, না করেছি কোন দিন?

ফুলকুমারী কহিল, পান-সুপারি কিনে গামালে বেরোও—ঐ রূপগঞ্জের দিকে।

দু-জনে অনেক পরামর্শ হইল। কথাটা মন্দ নয়। রূপগঞ্জের দিকে শনির দৃষ্টি পড়ে নাই, সেখানকার আবাদে লক্ষ্মী অফুরন্ত ভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়াছেন। এখন শীতকালে সচ্ছল গৃহস্থের ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা। চাষীরা যখন খেত-খামারে কাজে লাগিয়া থাকে, তখন ডালা

ভরিয়া পান-সুপারি, পুঁথির মালা, ঘুনসি, কাঠের চিরুনি ও আর দশটা শৌখিন জিনিষ গ্রামের মধ্যে ফিরি করিয়া বেড়াইবার সময়। চাষা-বউরা স্বামী-শ্বশুরদের লুকাইয়া এটা সেটা কিনিবেই। নগদ পয়সার কারবার নয়, হাতে কারও পয়সা নাই—চুরি করিয়া আঁচল ভরিয়া ধান চাল আনিয়া ফেরিওয়ালার ডালায় ঢালিয়া দিবে। এই করিয়া মোটামুটি অনেকের সংসার চলিয়া যায়।

কিন্তু ইহার মূলধনও চাই তিন-চার টাকা। ফুলকুমারী অভয় দিয়া কহিল, সে ঠিক হয়ে যাবে।

ত্রিলোচন বলিল, তা হবে। তোমার হাতে রূপোর বাউটিজোড়া আছে এখনও—

ফুলকুমারী চটিয়া কহিল, ঠিকই তো—রূপোর বাউটি আমি আর পরব না তো। ও উঠে গেছে—কেউ পরে না। আমায় তুমি সোনার বাউটি গড়িয়ে দিও, তাই পরব। পরিবে না বলিয়াই বোধ করি সে বাউটি খুলিয়া ত্রিলোচনের কাছে ছুঁড়িয়া দিল। হাতে শাঁখা দু'টি সম্বল রহিল।

পটেশ্বরী পুতুল খেলিতেছিল। সে-ও রোখে রোখে পুতুল আনিয়া বাপের কোলে ফেলিয়া দিল। বলিল, পুতুল বেচে ফেল বাবা। আমি সোনার পুতুল খেলব।

ত্রিলোচন আর্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বউ, তোরা মা-মেয়ে এমন শত্রুতা সাধতে লাগলি। সত্যি সত্যি আমার চোখের জল ফেলিয়ে ছাড়বি তবে—

চলিতে লাগিল মন্দ নয়। কাজটায় লাভ আছে, আর সে অনুপাতে খাটনি সামান্যই। দুপুরে ফিরিবার সময় ধানচালের ভারে

ত্রিলোচনের কাঁধ ঝাঁকিয়া যায়। অনেক দিনের পরে মুখ ভরিয়া সকলের হাসি ফুটিল।

বাড়ির একরশি তফাতে থাকিতেই পটেশ্বরী কেমন করিয়া জানিতে পারে, বাবা বাবা—করিয়া দু-হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আগাইয়া আসে। ত্রিলোচনের রৌদ্র-কাতর মুখ পলকের মধ্যে হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তাড়াতাড়ি দাওয়ার উপর বোঝা নামাইয়া বলে, আয় খুকী কোলে আয়—আসবি? খুকীর আপত্তি নাই; কিন্তু রান্নাঘর হইতে ফুলকুমারী বাহির হইয়া সব মাটি করিয়া দেয়। মেয়েকে তাড়া দিয়া বলে, সোহাগ থাক এখন। থতমত খাইয়া মেয়ে থামিয়া যায়।

ত্রিলোচন ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠে, ঐ রে—গন্ধ বেরুচ্ছে কেমন বউ, তোমার লাউয়ের ঘণ্ট ধরে গেল বুঝি। শিগ্‌গির যাও।

ফুলকুমারী ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলে। বলে, তা যাচ্ছি, কিন্তু মেয়েকেও নিয়ে যাচ্ছি। নাওয়াতে হবে এখন—

ত্রিলোচন বলে, আমি নাওয়াব। হঠাৎ সে গম্ভীর হইয়া যায়। বলে, তোমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে বউ, একজনের উপর সমস্ত···দু'খানা হাতের এক তিল জিরোন নেই। যা পারি, দেও না আমায় কিছু কিছু করতে। তাতে ক্ষয়ে যাব না।

ফুলকুমারী কহিল, একজন কেন? মোক্ষদা-দিদি তো আছেন। আর একা হই, যা-ই হই—তোমার কাছে তো কোনদিন নাকে কাঁদতে যাই নি কর্তামশাই? আমার সংসারে কেন তুমি কথা বলতে আসবে? কেন? ভয়ানক ঝগড়া হয়ে যাবে একদিন।

খাল আর বিল একঢালা হইয়া আছে আজকাল। কাছারির চাল ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে, নায়েব বরকন্দাজ কেহই সেখানে নাই, থাকিবার প্রয়োজনও নাই। জোয়ারের বেলা খালের জল ধাওয়া করিয়া

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা অবধি আসে, কোটালের মুখে কখনও কখনও রাস্তা ছাপাইয়া যায়, রৌদ্রালোকে অবাধ নোনাজল ঝক-ঝক করিতে থাকে, রাস্তায় দাঁড়াইয়া এখানে-সেখানে জাল ফেলিয়া পাড়ার লোক মাছ ধরিয়া থাকে। ত্রিলোচন এসব দিকে তাকাইয়াও দেখে না। সদর রাস্তা দিয়া গতায়াত ইদানীং সে এক রকম ছাড়িয়াই দিয়াছে।

পুকুর-ধারে গাবগাছের তলায় কালীঘর, পাড়ার ছেলে-মেয়েরা জুটিয়াছে, মহা সমারোহে কালীপূজার আয়োজন চলিয়াছে। পটেশ্বরী হইয়াছে স্বয়ং কালী-ঠাকরুন—জিভ মেলিয়া চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছে। দাসের বাড়ির সোনা কামার হইয়া তালপাতার খাঁড়া লইয়া হাড়িকাঠের সামনে প্রস্তুত, এখন একটা কোন পাঁঠা পাইলে হয়। সমস্ত দুপুর পাঁচ-ছয় জনে মিলিয়া মাঠে ছুটাছুটি করিয়াও সত্যকার পাঁঠা ধরিতে পারে নাই। হারাণ এমনি সময়ে থপথপ করিতে করিতে আসিল।

দিদি, দিদি গো—

কামার চঞ্চল হইয়া উঠিল, ঐ ঐ···হারাণ হবে পাঁঠা—

হারাণ খুব খুশি, ঘাড় নাড়িয়া রাজি হইল। পটেশ্বরীর প্রস্তাব ভাল লাগে না। অমন সোনার মতো ভাই—পৈতা পরিয়া পুরুত হইলে বরঞ্চ মানাইত তাকে, পাঁঠা হইতে সে যাইবে কেন? ডেঙাং করিয়া গলায় কোপ মারিবে, জোরে যদি মারে তার কত ব্যথা লাগিবে···কিন্তু মুশকিল হইয়াছে, কালী হইয়া এখন সে কথা বলে কি করিয়া? তারপর সিঁদুরের অভাবে কাদার ফোঁটা দিয়া পুরুত যখন সত্য সত্যই পাঁঠা উৎসর্গের আয়োজন করিতে লাগিল, কালীর পক্ষে আর জিভ মেলিয়া দাঁড়াইয়া থাকা চলিল না। ভাইকে লইয়া একছুটে চলিয়া গেল। আর সবাই হতভম্ব, খেলা ঐ পর্যন্ত।

সেইদিন শেষ-রাত্রে আকাশ ভরিয়া তারা ঝিলমিল করিতেছে। হঠাৎ খোকা মা মা—করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সারাদিনের শ্রমক্লান্ত ফুলকুমারী সর্বাঙ্গ এলাইয়া অঘোর ঘুম ঘুমাইতেছে, সে জাগিল না। খোকা রহিয়া রহিয়া কাঁদিতেছে। ও ঘরে মোক্ষদা জাগিয়া উঠিয়া ডাকিতে লাগিল. ও বউ, বউ! দেখ তো ত্রিলোচন, খোকা কাঁদছে কেন এত?

সকালবেলা ছেলে নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে, চক্ষু হইয়াছে আগুনের ভাঁটা। ক্রমশ সে ঝিমাইয়া আসিতে লাগিল, ক্ষীণ জড়িত কণ্ঠে এক-একবার বলে—জল!

মোক্ষদা হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কি সর্বনাশ হল রে! বউ, খোকাকে কি খাইয়েছিলে? কি বিষ হাতে তুলে দিয়েছিলে কালকে?

পটম্বরী মুখ চুণ করিয়া ঘুরিতে লাগিল; বাপের হাঁটু ঝাঁকাইয়া কহিল, বাবা, দাদুধন অমন করে রইল কেন? ডাকলাম, তা উত্তর দেয় না।

এ দরজা দিয়া হারাণকে বাহির করা হইল, ওদিকে মা-মেয়ে দু'জনেই সেই বিছানা লইল। পাড়ার মানুষ-জন উঠানে দাঁড়াইয়া ত্রিলোচোনকে খুব সাহস দিয়া এখন যে যার মতো সরিয়া পড়িয়াছে। আছে একলা হরিপদ। প্রবীণেরা যাইবার মুখে চোখ ঠারিয়া তাহাকেও সাবধান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে গোঁয়ার-গোবিন্দ মানুষ—ফুলকুমারীর বাপের বাড়ির কি-একটা সম্পর্কও যেন ছিল, তাহাকে দিদি—বলিয়া ডাকে, কাহারও হিত কথা না মানিয়া ওলাওঠার মধ্যে সে রহিয়া গেল। পাঁচ-সাত গ্রামের মধ্যে আছে এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, তিনি একবার দেখিয়া এক ফোঁটা করিয়া ঔষধ দিয়া গিয়াছেন। দিন সাতেকের মধ্যে আর ঔষধের আবশ্যক হইবে না, সাত দিনের পর খবর দিতে

বলিয়াছেন। মোক্ষদা বাহির হইতে হাতছানি দিয়া ডাকিল, হরিপদ উঠিয়া গেল।

মোক্ষদা কহিল, ভাসুরপোরা নাছোড়বান্দা—কি করি বল, তাদের সংসার অচল। আর এ অবস্থায় ত্রিলোচনকেই বা বলি কি করে সব সেরে সুরে উঠুক, জিজ্ঞাসা করলে বোলো, আমি চৌগাছায় চলে গেছি।

তিক্ত কণ্ঠে হরিপদ বলিল, যাও দিদি, শিগ্‌গির চলে যাও—চৌগাছার পথ যম তো চেনে না। বিরক্ত মুখে রোগীর পাশে আসিয়া সে বসিল। ত্রিলোচন দুই হাঁটুতে মুখ গুজিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে।

দুপুরের দিকে খুব মেঘ করিয়া বৃষ্টি নামিল। ফুটা চালে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতেছে। ত্রিলোচনের যেন সম্বিৎ নাই, উবু হইয়া এক জায়গায় বসিয়া বসিয়া ভিজিতে লাগিল। আর হরিপদ বিছানা সমেত রোগীদের সমস্ত ঘর টানিয়া টানিয়া বেড়ায়। যেখানে যায়, সেইখানেই জল। আবার সরাইয়া লইতে হয়।

বাহিরে ঢেঁকিশালের কাছে শিশুর শব পড়িয়া পড়িয়া ভিজিতেছে, আগলাইবার একটা লোক নাই।

কাঁধে ঝাঁকি দিয়া ত্রিলোচনকে হরিপদ ডাকিল, ও দাদা, শোন একটা কথা। ওই উঠোনে ওটা পড়ে পড়ে ভিজছে—একটা গাত করে আসা যাক। তুমি এদিকে একটু নজর রাখ আমি আসি গে—

ত্রিলোচন হরিপদর হাত আঁটিয়া ধরিয়া বলিল, একটু সবুর কর্ ভাই। সবসুদ্ধ এক চিতেয় হয়ে যাবে। বার-বার টানাটানি করতে হবেনা।

ঘটিলও তাই। মানুষ-জন ডাকিয়া কাঠকুটার জোগাড় করিয়া তিনটি শব খালের ধারে শ্মশানে লইয়া যাইতে পরদিন বেলা দুপুর হইয়া গেল। ত্রিলোচন শান্তভাবে শেষ কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিল। খালের জলে জমি ভাসাইয়া একদিন যেমন ঘরে ফিরিয়াছিল তেমনি।

হরিপদর সাধাসাধিতে সন্ধ্যার সময় তার বাড়িতে গিয়া চারিটি ফ্যানসা ভাতও মুখে দিয়া আসিল।

মাসখানেক কাটিয়া গেল। আবার ত্রিলোচন ফিরি করিতে শুরু করিয়াছে।

পান নেবে গো, চিকি-গুয়ো?

রূপগঞ্জের দিকে যায় বটে, কিন্তু পাড়ার মধ্যে বেশিক্ষণ থাকিতে পারে না। খাল তাহাকে টানিতে থাকে। কোন গতিকে দু-চার পয়সার বিক্রি হইলেই, পাড়া ছাড়িয়া সে খালের ধারে আসে। কূলে কূলে জোর গলায় হাঁকিয়া যায়। জলতরঙ্গ যেন তার খরিদ্দার। নিস্তব্ধ দুপুরে সমস্ত গ্রাম যখন ঝিমাইয়া পড়ে, বহু দূরের খালধার হইতে ত্রিলোচনের কণ্ঠ অস্পষ্ট ভাসিয়া আসে—

ঘুনসি চাই, আয়না চাই, পুতুল চাই, রাঙা রাঙা—আ—আ—

হরিপদ মাঝে মাঝে বলে, দাদা ওখানে হাঁক পেড়ে কাদের শোনাও?

ত্রিলোচন হাসিয়া ব্যাপারটা বুঝাইয়া দেয়। নৌকো করে দেশ-বিদেশের মানুষ যায়, জানিস? পথ-চলতি মানুষ—তাদের কাছে দর-দাম নেই, এক পয়সার মাল চার পয়সা—বড্ড লাভের কাজ—

অবিশ্বাসের ভাবে মাথা নাড়িয়া হরিপদ বলে, ক'টাই বা যায় নৌকো! এ্যাদ্দিনে কত বেচেছ, বল তো শুনি?

ত্রিলোচন বলে, তুই তার জানবি কি! ব্যবসা খর্ আগে, তখন বুঝবি কোথায় কি মজা।

আর এক কাণ্ড হইল। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, ত্রিলোচন লোকজন ডাকিয়া ঢেঁকিশালের চাল নামাইয়া চারিদিকের বেড়া খুলিয়া

হৈ-হৈ করিয়া খালের পাড়ে চরের উপর আনিয়া ফেলিতেছে। ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া বুড়া একলাই দশ-বারোটা খুঁটি পুতিয়া ফেলিল। শুনিয়া হরিপদ আসিল। আশ্চয হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, গ্রাম ছেড়ে এখানে এসে কুঁড়ে বাঁধছ, মতলবটা কি বল তো দাদা?

শোন্, তবে তোকেই বলি—কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিসফিস করিয়া ত্রিলোচন বলে, কাউকে বলবি নে কিন্ত। ফিরি করে বেড়িয়ে আর তেমন জুত হচ্ছে না। নতুন ব্যবসা ধরব ভাবছি। রাত্রে মাছের নৌকো খাল দিয়ে যায়, সস্তায় মাছ কিনে রাখব—সকালের বাজারে বিক্রি হবে। তুই জানিস নে হরিপদ, বড্ড লাভ এতে।

হরিপদ বলিল, এই শ্মশান-ঘাটের উপরে বসে রাত্তিরে তুমি মাছের নৌকোর খোঁজ করবে? ভূত-পেত্নীতে কোন্‌দিন ঘাড় ভাঙবে তোমার!

হাসিয়া হাসিয়া বুড়া বলে, ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ মাথার উপর—করবে আমার কি? জানিস হরিপদ, আমার কত কষ্টের জমি এই সব—ধান হয় না আজকাল, চর পড়ে গেছে। আর কিছু না হোক চরের উপর শুয়ে বসে তবু তো উশুল হবে খানিক—

হাস্যোজ্জ্বল কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ বিষণ্ণ ও উদাস হইয়া উঠে।

চরের উপরে ত্রিলোচন পাকাপাকি বসবাস শুরু করিল। মাছের নৌকা সম্পর্কীয় কথাটা মিথ্যা নয়। দশানি বউ-মারির বিল প্রভৃতি অঞ্চলে মাছের আবাদ। মাছ-বোঝাই বিস্তর নৌকা রাত্রের জোয়ারে উজান বাহিয়া খাল দিয়া বাহির-গাঙে পড়ে, গঞ্জে সকালের বাজারে সেই মাছ বিক্রি হয়। রাত্রে ঝুড়ি হিসাবে তার কতক কিনিয়া রাখিয়া খুচরা বেচিতে পারিলে লাভের কথাই বটে। কিন্তু তা-ও বড়

সুবিধা হইল না। মাছের নৌকা সোরগোল করিয়া খাল দিয়া যখন চলিয়া যায়, ত্রিলোচনের সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

ঠিক দুপুরে মণ্ডলপাড়ার গণশার বউ রাঙা শাড়ি পরিয়া ভাইয়ের সঙ্গে খালধার দিয়া বাপের বাড়ি চলিয়াছে। বউটি অল্পবয়সি—স্বভাব বড় চঞ্চল; বাপের বাড়ি চলিয়াছে, তা যেন নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। ত্রিলোচন তখন দাওয়ার খুঁটি ঠেস দিয়া মহানন্দে গোপীযন্ত্র বাজাইতেছে।

বউ একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। উঁকি দিয়া দেখিয়া চিনিতে পারিল—সে উহার একজন খরিদ্দার। রাস্তা হইতে জিজ্ঞাসা করিল, ও বুড়ো, পান-সুপারি বেচ না আজকাল?

উঁহু—বলিয়া ত্রিলোচন বাজনা রাখিয়া চট করিয়া রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইল।

বউটি বলিল, তাই দেখতে পাই নে। তা বেচ না কেন?

আর মা, সে কি হবার জো আছে? হাতের ইসারায় সে ঘরের দিকে দেখাইয়া দিল। বলিতে লাগিল, বল কেন মা, পঙ্গপালের দল—খেয়ে-দেয়ে ফেলে-ঝেলে সমস্ত একাকার। সব পুঁজি খোয়া গেছে—

বউটি অত শত জানে না। অতি জীর্ণ নিঃশব্দ কুড়েখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, কই, ছেলেপিলে কাউকে দেখছি না তো?

বুড়াও এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিল, ছিল সব এইখানে। কোন্‌দিকে গেছে হয়তো। একদণ্ড স্থির হয়ে থাকবার জো আছে? বল কেন মা, কর্মভোগ। হঠাৎ ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল, একটা পান দিতে পার গো ভালমানুষের মেয়ে? সঙ্গে আছে-টাছে নাকি? কদ্দিন যে খাই নি···সব নিয়ে পালিয়ে চলে যায়—

সধবা মানুষ, একবেলার পথ যাইতেছে, আঁচলে বাঁধা পান-চুণ-সুপারি সমস্তই ছিল। বউটির ইচ্ছা হইতেছিল, ঐখানে বসিয়া একটা পান সাজিয়া দেয়। সঙ্গের ভাই কিন্তু তাড়া দিয়া উঠিল, নে নে—চল্। যেতে হবে কদ্দূর, হুঁস আছে?

ত্রিলোচনের বিশুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া মণ্ডলপাড়ার বউটি বলিল, তোমার খাওয়া হয়েছে বুড়ো? হয় নি এখনও—না?

আচ্ছা বোকা তো! পান চাচ্ছি কেন তবে? পেটে ভর না থাকলে ফূর্তি আসে এত? বলিয়া স্ফূর্তির চোটে ত্রিলোচন একেবারে অট্টহাসি হাসিতে শুরু করিল।

রাত্রে এক-এক দিন সত্য-সত্যই ভারি স্ফূর্তি জমিয়া আসে। ত্রিলোচনের ঘরের পাশে অনেকখানি জুড়িয়া বালুচর। জোয়ারের বেগে জল খলবল করিয়া চরের উপর লুটাইয়া পড়ে। ত্রিলোচন তখন ঘরের মধ্য হইতে হাঁকিতে থাকে, এই!—এইও। হঠাৎ বা চিৎকার করিয়া গালি দিয়া ওঠে, ওরে হারামজাদারা, ঘুমুতে দিবি নে আজ? জলতরঙ্গ থামে না। তারপর বড় অসহ্য হইয়া উঠিলে লাঠি লইয়া বাহির হয়, উন্মাদের মতো চরের উপর জলে জলে তাড়া করিয়া বেড়ায়, যেদিকে জলোচ্ছ্বাস প্রবল হয়—লাঠি লইয়া ছুটে, আবার হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে লাঠি ফেলিয়া বালুর উপর লুটাইয়া পড়ে। হয়তো বা এমনি সময় দূরে মানুষের কথাবার্তা শোনা যায়, মাছের নৌকা সব আসিতেছে, কখন বা ঝুপঝাপ দাঁড় পড়ে, কখন বা গুণ টানিয়া আনায় গুণ-টানা মানুষের হাতে হেরিকেনের আলো দুলিয়া দুলিয়া চলে। ত্রিলোচন অমনি ভালমানুষ হইয়া দাওয়ায় আসিয়া ওঠে, হুঁকা-কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে বসে, আগুন মনে গজ-গজ করে, চিরটা কাল

এক ভাবে গেল। শুয়ে স্বস্তি নেই বেটাদের জ্বালায়। তুপুর রাতেও জড়াজড়ি করে মরছে, ঘুম নেই একটু চোখে! চুপ করতে পারিস নে ওরে হারামজাদারা?

নৌকাগুলি সরিয়া গেলে, আবার শাসাইয়া চিৎকার করিয়া ওঠে, র,—জব্দ করছি। কালই যাব রূপগঞ্জের দিকে। বলছিল তো নেত্য মোড়ল—জায়গা দিচ্ছি, এস, ঘর বাঁধ। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হবে তা হলে। দেখি, তখন কাকে জ্বালাতন করিস? কেঁদে পথ পাবি নে—হ্যাঁ।

জোরে জোরে টানিয়া তামাক শেষ করিয়া বিরক্ত মুখে অবশেষে বুড়া শুইয়া পড়ে। কিন্তু ঘুম আসে না।

একদিন সকালবেলা একদল পশ্চিমি কুলি অনেক ঝুড়ি-কোদাল লইয়া আসিল। সঙ্গে নায়েব-মশায় আসিয়াছেন। অনেক দিনের পর দেখা, ব্রাহ্মণ মানুষ—ত্রিলোচন গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

নায়েব বলিলেন, খবর ভাল ত্রিলোচন? আরে আরে—এ কি চেহারা হয়েছে তোমার? আবার এইখানে এসে কুঁড়ে বেঁধেছ—বলি, বাড়ির সঙ্গে বচসা হয়েছে বুঝি?

ত্রিলোচন কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, খেতে পাচ্ছি না নায়েব-মশায়।

নায়েবের মনে বড় লাগিল। মনে তো আছে, এই মাতব্বর প্রজার কি প্রতাপ ছিল একদিন! সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, আর তুঃখ থাকবে না বাপু। কর্তাবাবুকে জপিয়ে জপিয়ে রাজি করেছি। মঞ্জুর হয়ে গেছে, খাল বাঁধা হয়ে লক-গেট হবে এখানে। আজকে ভাঁটা কখন রে?

হিসাব করিয়া দেখা গেল, ভাঁটা পড়িতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া যাইবে।

নায়েব সঙ্গের লোকজনকে হুকুম দিলেন, তবে বাঁশগুলো এই

এখানে এনে জমায়েৎ কর্। আজকের দিনটে খোঁটা পুঁততেই যাবে। মাটি পড়বে কালকের থেকে।

এদিকে নদীর পথে চুণ-সুরকি ও লোহালক্কড় বোঝাই নৌকা আসিয়া জমিতে লাগিল। নৌকা খালের মধ্যে রাখিয়া বাবলাগাছে বাঁধা হইল। মাটির বাঁধ দেওয়া হইয়া গেলে এসব তারপর লাগিবে।

নায়েব বলিলেন, আর ভাবনা কি ত্রিলোচন? যার যে জমি ছিল, সব জরিপ-আলবন্দি করে দেওয়া হবে। এক ছটাক এদিক-ওদিক হবে না। বাবু আমাদের সদাশিব। তিনি একেবারে লিখিত হুকুম দিয়েছেন। এই ধরো—পাঁচ-সাত মাস, তারপর লেগে যাও সবাই চাষবাসে।

খোচের উপর সে নিরন্ন ভিখারি হইয়া গেল, একবাড়ি মানুষ একে একে সব মরিয়া গেল—ত্রিলোচন নির্জনে কি করিত কে জানে, কিন্তু মানুষের সামনে কেহ তার চোখে এক ফোঁটা জল দেখে নাই। এতদিন পরে কি হইল—নায়েবের সামনে একেবারে সে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, চাষ করব নায়েব-মশায়—খাবে কে? রাক্কুসি গাঙ জমি ফিরিয়ে দেবে, মানুষ তো ফিরিয়ে দেবে না আর!

একটা-একটা করিয়া সমস্ত কাহিনী সে বলিয়া গেল। নায়েব তামাক খাইতে খাইতে নিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, ভগবানের মার, তুমি আমি করব কি? যাই হোক—কুছ পরোয়া নেই। বয়সটা আর কি তোমার! চল্লিশ পেরোয় নি—বিয়ে-থাওয়া কর আবার। আমি তোমার বিয়ে দিয়ে দেব। টাকা না থাকে, বিঘে দুই জমি ছেড়ে দিও। হু-হু করে জমির দাম বেড়ে যাবে এখন।

ত্রিলোচন হাঁ না কিছু বলিল না। কাছারি-ঘরের খড় উড়িয়া গিয়াছে, বেড়া খসাইয়া লোকে ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে, নূতন ঘর না বাঁধা পর্যন্ত কাছারিতে গিয়া দাঁড়াইবার উপায় নাই। ত্রিলোচনের

কথায় নায়েব সেই বেলাটা তার ঘরে রান্নাবান্না করিলেন। বিকালে তিনি রূপগঞ্জের এক কুটুম্বের বাড়ি চলিলেন, রাত্রিটা সেখানে কাটাইবেন। বলিলেন, এক কাজ কর ত্রিলোচন। কাছারি-টাছারি হবার তো দেরি আছে—যে কদিন না হচ্ছে, আমায় ছুটোছুটি করতে হবে এই রকম। দু' বেটা বরকন্দাজ এনেছি, কিচ্ছু বোঝে না—নোনা দেশে এই তারা প্রথম এল। কাজকর্ম সমস্ত তুমি দেখাশুনো কর; আমি এ-সম্বন্ধে ব্যবস্থা করব।

কৃতার্থ হইয়া ত্রিলোচন ঘাড় নাড়িল।

এখন গাঙে টান বেশি নাই। ত্রিলোচন শুইয়া শুইয়া অনেক দিনের পরে আশার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। নাকে কেমন যেন ধানের জোলো গন্ধ আসে। ঘরের পাশে বালুচরের উপর নৈশবাতাসে ধানের পাতার শির-শির শব্দ ভাসিয়া আসে। শুইয়া শুইয়া দৃষ্টির সম্মুখে দেখে, ঘন নীল ধানের সমুদ্র আবার দিগন্ত অবধি চলিয়াছে। ঠক-ঠক করিয়া তার মধ্য দিয়া তীর-গতিতে তালের ডোঙা ছুটিয়াছে, কত সাপলা ফুটিয়াছে, কত কলমিফুল, শোলার ঝাড়—আলের উপরে ঝির-ঝির করিয়া জল যায়, খলসে পুটি সব খলবল করিয়া উজাইয়া উঠে।··· উঠান ঢাকিয়া ফেলিয়া আবার ঘর উঠিয়াছে, গোলা উঠিয়াছে। রূপার খাড়ু পায়ে বউ এঘর-ওঘর করিতেছে, ন-পিসি, রাণী, তারিণী, ফুলি যে যেখানে ছিল সব আসিয়াছে. ছেলেপিলের চিৎকারে গণ্ডগোলে ঘুমাইবার আর জো থাকিল না। লাঠি-হাতে এক লাফে ত্রিলোচন ঘরের দাওয়ায় নামিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, ওরে হারামজাদারা!

সব হারামজাদারা ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে, নিঃশব্দ নির্জন খালের ধারে অপরূপ বিজনতায় শেষ-রাত্রি থম-থম করিতেছে। জলেরও টান

নাই, কেমন যেন চুপচাপ ভাব। ত্রিলোচন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বড্ড যে জ্বালাতন করে মারিস, ওরে হারামজাদারা! এখনও হয়েছে কি! বাঁধ আগে হয়ে যাক, টের পাবি তখন—

কাঁচা বাঁধ শেষ হইতে হইতে আবার কোটাল আসিয়া গেল। বিকালবেলা দেখিয়া শুনিয়া নায়েব খুশি মুখে রায় দিয়া গেলেন, নাঃ— আর ভয় নেই। কাজ বাকি থাকলে ভয়ের কথা ছিল বটে! কোটালে সব মাটি ভাসিয়ে নিয়ে যেত। তোমার জন্যেই হল ত্রিলোচন। দিন রাত খেটেছ, লোক খাটিয়েছ, তবেই হয়েছে। নিজের একটু ইয়ে না থাকলে, ভাড়াটে লোক দিয়ে হয় এ-সমস্ত? বাবুকে আমি লিখে দেব তোমার কথা।

বাঁধ নদীর একেবারে মোহানার কাছে। পূর্ণিমায় সেদিন নদী বড় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সন্ধ্যেবেলা ত্রিলোচন নূতন বাঁধের উপর দিয়া ঘরে ফিরিতেছিল, বাঁধের গায়ে জলতরঙ্গ তখন অপরূপ নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সাগরপারের শিশু—জীবন্ত, প্রাণচঞ্চল—হাসিয়া নাচিয়া কতরূপে তাহার মন ভুলাইতে চায়! ত্রিলোচন অন্যমনস্ক হইয়া চলিয়াছিল, তরঙ্গ আসিয়া হঠাৎ পা ভিজাইয়া পরনের কাপড় ভিজাইয়া দিয়া খলবল করিয়া পলাইয়া গেল। ত্রিলোচন ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, কেমন রে? কেমন জব্দ এবার বল দিকি, ওরে হারামজাদারা!

সে রাত্রে ত্রিলোচনের ঘুম নাই। রাত্রি বাড়িতে লাগিল, চাঁদ মাথার উপরে, চারিদিকে অতল নিঃশব্দতা, সেই অনেকদিন আগেকার পিসির বাড়ির মতো। পৃথিবীর বুকের শেষ স্পন্দনটুকুও যেন এ রাত্রে থামিয়া গিয়াছে। তার মনে কিন্তু আনন্দের পার নাই। আনন্দভরা

মনে বার-বার ভাবিতেছিল—আর কি, আর তো কোন অসুবিধা রহিল না! ধানে ধানে ক্ষেত ভর্তি, গোলা ভর্তি; মানুষে মানুষে বাড়ি ভর্তি, আর ভাবনা কি?...তারপর উঠিয়া তামাক সাজিয়া লইল, ফড়-ফড় করিয়া তামাক খাইতে লাগিল, সে তামাক শেষ হইয়া গেল। পায়ে পায়ে সে খালের ধারে আসিল। হো-হো করিয়া হাসিয়া গাঙ-পার অবধি শুনাইয়া শুনাইয়া সে চেঁচাইয়া বলিল, ওরে হারামজাদার দল, বড় যে জ্বলিয়ে মারতিস। থাক্ আটকা পড়ে ঐদিকে।

ঠাণ্ডা হাওয়ার শেষে শীত ধরিয়া যায়। ঘরে আসিয়া কাঁথা মুড়ি দিয়া পড়িল। মানুষ-জন নাই, হাওয়া নাই, জলের কলধ্বনি নাই—এমনি রাত্রে তো ঘুমের সুবিধা! কিন্তু ঘুম আজ কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত রাত্রি ত্রিলোচন একবার ঘর—একবার খালধার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। নিশি-পাওয়া লোকের মতো চাঁদের আলোয় খালের ধার দিয়া অনেক দূর অবধি চলিয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসে।

তারপর হঠাৎ কি হইয়া গেল—হাওয়া ছিল না, হঠাৎ কোথা হইতে এক ঝাপট হাওয়া বহিয়া গেল, খালের জল ছল-ছল করিয়া নাচিয়া উঠিল, বাদুড়ের ঝাঁক কালো ছায়া ফেলিয়া মাথার উপর উড়িতে লাগিল। চমক ভাঙিয়া ত্রিলোচন সেই মুহূর্তে শুনিল—হু-হু-হু-হু—অনেক দূরের বিরামবিহীন একটা একটানা শব্দ। ঘুমের দেশে কোথায় বিপ্লব বাধিয়া গেছে, শত সহস্রে মিলিয়া মাথা খোঁড়াখুড়ি করিতেছে—বাতাসে চাঁদের আলোর ক্ষীণতম করুণতম কান্না। গ্রহ-গ্রহান্তরের কোটি কোটি ক্রোশ পার হইয়া আসা কান্না,—নিশীথ রাত্রি নিরালা পৃথিবী মেঘহীন আকাশ একসঙ্গে গলা মিলাইয়া কাঁদিতে বসিয়াছে—মৃত্যুপুরীর কঠিন কালো কপাটের ফাঁক হইতে কান্না অনেক কষ্টে গলিয়া গলিয়া যেন বাহির হইয়া আসিতেছে।...যে রাত্রে চাঁদ বড় উজ্জ্বল হইয়া মাথায়

জাগিয়া থাকে, কিছুতে কোন রকমে চোখের পাতা এক হইতে চায় না—অনন্ত-আয়তন সৌরজগতের মধ্যে ক্লান্ত শ্লথচরণ নিঃসঙ্গ পৃথিবীর একটি মাত্র অধিবাসী—সেই ইহা শুনিতে পায় কখনও কখনও। ত্রিলোচন শুনিতে লাগিল, সমস্ত ইন্দ্রিয় উন্মুখ করিয়া অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিল। মাঠের পারে গাঙের ধারে কারা আসিয়া জমিয়াছে, কেউ করুণ শান্ত চোখে তাকাইয়া থাকে, কেউ মাথা নাড়িয়া ইসারা করে, কেউ হাততালি দেয়, কেউ বা অস্পষ্ট ক্ষীণ কণ্ঠে অথচ প্রাণপণ বলে ডাকাডকি করে—

বাবা—বা-বা-গো-ও-ও-ও—

যাই।

স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো ত্রিলোচন ছুটিল। ছুটিয়া নদীতীরে নূতন বাঁধের ধারে আসিল। জোয়ার আসিয়াছে। ভরা পূর্ণিমার প্রমত্তবেগ জোয়ার জলতরঙ্গ অধীর আবেগে বাঁধের গায়ে মাথা ভাঙিতেছে। জনভূমি হইতে দূরে নিস্তব্ধ নদীকূলে ভয় পাইয়া তারা খালের পথে গ্রামে গিয়া ঢুকিতে চায়। কঠিন মাটি পথ দিবে না। ছুটিয়া আসিয়া লাফাইয়া এক-এক বার বাঁধ পার হইতে চায়—উঁচু বাঁধ কিছুতে পার হওয়া যায় না। বাঁধের একেবারে উপরে গিয়া ত্রিলোচন দাঁড়াইল। থালার মতো চাঁদ পশ্চিমে চলিয়াছে। অনেক বার সে ইতস্তত করিল, অনেকক্ষণ বাঁধের এপার-ওপার ঘুরিয়া বেড়াইল। তারপর এদিক-ওদিক চাহিয়া একটি চাঁই তুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিল। ফিসফিস্ করিয়া কহিল, আয়, গুঁড়ি মেরে আয়—ওরে হারামজাদারা। সাবধান —বাঁধ ভাঙে না যেন। পারবি নে? আয়—আয়—

আর একটা—তারপর আবার, আরও—আরও—। বিশ-ত্রিশটা চাঁই ফেলিয়া দিলে আর তাহাকে কষ্ট করিতে হইল না, জলধারা পথ

পাইয়া গেল। অসীম শ্রমে এতদিন ধরিয়া এত লোকে মিলিয়া বাঁধ দিয়াছে, বাঁধ ভাঙিল, গোটা অঞ্চলটা জুড়িয়া মানুষের আশা ভাঙিল, ধান, বাড়ি-ঘর-দোরের সমস্ত স্বপ্ন জলস্রোতে নিঃশেষ হইয়া গেল। তারপর সে এক অদ্ভুত ব্যাপার—নন্দ আসিল, পটেশ্বরী আসিল, হারাণ তিনু টুনি সকলে আসিল, অনন্ত কাল ধরিয়া তিনু-টুনির মতো যত খোকা-খুকু নদীর জলে গিয়া রহিয়াছে—তিনুর হাত ধরাধরি করিয়া শ্মশানঘাটা হইতে তারাও সব উঠিয়া আসিল। অতল··· পাতালপুরী···সাপের মাথার মাণিক চুরি গিয়াছে, তাই আলো নাই···হাজার শিশু আসিয়া হাজার হাজার বাহু দিয়া স্নেহ-বুভুক্ষু বুড়াকে চাপিয়া ধরিয়াছে, কেহ ধরিয়াছে গলা, কেহ হাত, কেহ পা···জলতরঙ্গ নাগপাশের মতো বেড়িয়া ধরিয়াছে।

ওরে হারামজাদারা, ছাড়্ ছাড়্—লাগে—

কে কার কথা শোনে? বিপুল আনন্দ-বন্যায় জলোচ্ছ্বাসে কুটার মতো তারা বুড়াকে ভাসাইয়া লইয়া গেল।

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট। মুদ্রাকর—গিরীন্দ্রনাথ সিংহ, দি প্রিন্টিং হাউস, ২০, কালিদাস সিংহ লেন। শিল্পী—নরেন মল্লিক। ব্লক ও কভার মুদ্রণ—ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও। বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

মনোজ বসুর

সৈনিক ৫ম সং। 'বলিষ্ঠ আশাবাদ, নবযুগের দৃষ্টিভঙ্গি, দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম গভীর অনুরাগ 'সৈনিক' উপন্যাসখানিকে আমাদের জাতীয় সাহিত্যে অনন্যমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবে'—**যুগান্তর**। 'এই বইখানি একাধারে ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শন'—**দেশ**। সাড়ে তিন টাকা।

বাঁশের কেল্লা ২য় সং। 'জাতীয় প্রতিরোধ-আন্দোলনের গৌরবময় পটভূমিকায় আলোচ্য উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে। খ্যাতিমান সাহিত্যিকের মধুক্ষরা লেখনীর মুখে নীলবিদ্রোহ, সশস্ত্র অভিযান, লবণ-সত্যাগ্রহ ও আগস্ট-বিপ্লবের অশ্রুসিক্ত অধ্যায়গুলি জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।···মর্মচের আত্মদানের বিস্মৃত-প্রায় বিচিত্র কাহিনী, সংগ্রাম ও সংগঠনের ভুলে-যাওয়া ইতিহাস চলচ্চিত্রের মতোই একে একে ছায়া ফেলিয়া যায় মনে। ইতিহাসের সেই ঝরাপাতা কুড়াইয়া সাহিত্যের রসে ভিজাইয়া লেখক জাতির জীবন-প্রবাহকে সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন'—**যুগান্তর**। দুই টাকা চার আনা।

ভুলি নাই ২০শ সং। আধুনিক কালের সর্বাধিক বিক্রীত উপন্যাস। এই বইয়ের চিত্ররূপও অসামান্য সাফল্যলাভ করেছে। দুই টাকা।

ওগো বধূ সুন্দরী ২য় সং। স্নিগ্ধ-মধুর প্রেমের উপন্যাস। আগাগোড়া দুই রঙে ছাপা। বিচিত্র প্রচ্ছদপট। উপহারের শ্রেষ্ঠ রুচিসম্মত বই। দুই টাকা বারো আনা।

আগষ্ট, ১৯৪২ ২য় সং। আগস্ট-বিপ্লবের পটভূমিকায় রচিত বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম স্মরণীয় সুবৃহৎ উপন্যাস।

'Monoj Babu has caught the spirit of the August rebellion and has also adopded to it something of his own. In this volume he has told a few of the human stories which the flame, smoke and blood has engulfed at time and which he has knit together in an integrated whole—**হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড**। চার টাকা।

জলজঙ্গল সুন্দরবনের দীর্ঘব্যাপ্ত অরণ্য ও অরণ্যচারীদের নিয়ে উপন্যাস। আমাদের কত নিকটে বসতি অথচ কত দূরের মানুষ তারা! বিচিত্র তাদের জীবনরীতি, অনুরাগ ও জিঘাংসা। শীঘ্রই বেরুবে।

শত্রুপক্ষের মেয়ে ২য় সং। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরিবেশ। খরস্রোত বসতিবিরল চরের উপর দুর্ধর্ষ মানুষের জীবন-চিত্র। 'Sj. Manoj Bose has a striking manner of reproducing atmosphere—of bringing to the readers' mind the vast alluvial strecthes, the mighty rivers in spate, fearless spirits in the passion for fight and the ways of human heart that beat the same through different ages and times —**অমৃতবাজার**। সাড়ে তিন টাকা।

যুগান্তর 'শত্রুপক্ষের মেয়ে' উপন্যাসের কিশোর-সংস্করণ। রসসমৃদ্ধ অপরূপ পরিবেশ। ছেলে-মেয়েদের হাতে তুলে দেবার সর্বাংশে উপযোগী। দুই টাকা।

মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প বাছাই-করা গল্পের সংকলন। একখানি বইয়ের ভিতর দিয়েই মনোজ বসুর সৃষ্টির সমগ্র রূপটি প্রস্ফুটনের চেষ্টা হয়েছে। লেখকের জীবনকথা, ছবি এবং অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের রসসমৃদ্ধ ভূমিকা বইটিকে অনন্যসাধারণ মর্যাদা দিয়েছে। পাঁচ টাকা।

কাচের আকাশ 'গল্প বলায় মনোজবাবুর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আলোচ্য পুস্তকের সব গল্পগুলিতে পরিস্ফুট। পড়তে পড়তে মনে হয় কে যেন সামনে বসে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে, বড় মিষ্টি। ওস্তাদ বাজিয়ে অনেকে হতে পারেন, কিন্তু 'হাত মিষ্টি' সবার ভাগ্যে হয় না। লিখতে অনেকে পারেন, কিন্তু মনোজবাবুর মত এমন সহজে মনকে ছোঁবার ক্ষমতা বোধ হয় কম লেখকের আছে'—**দেশ**। দুই টাকা।

পৃথিবী কাদের? ৩য় সং। নবযুগের বলিষ্ঠতম গল্প। 'It is a departure in the fiction-literature of the Province'—**অমৃতবাজার**। দেড় টাকা।

বনমর্মর ৩য় সং। 'যে retrospect, চিন্তার গভীরতা এবং মনের বেদনা-বোধ থাকিলে লেখা চিরন্তনের পর্যায়ে গিয়া পৌছায়, তাহা মনোজ বসুর আছে—**পরিচয়**। আড়াই টাকা।

রাখিবন্ধন ২য় সং। 'নূতন প্রভাত'-স্রষ্টার অগ্নিক্ষরা নবীন নাট্য-সৃষ্টি। 'বিদেশী শাসকের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে দুর্বার জাতীয় প্রতিরোধের কণ্ঠরুদ্ধ করিবার জন্য দেশীয় তাঁবেদারদের সহায়তার শাসক-গোষ্টির বর্বর অত্যাচার এবং জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নিঃশব্দ দুঃখবরণ ও মর্ম-চেরা আত্মদানের কাহিনীকেই মূলত উপজীব্য করিয়া এই নাটকখানি গড়িয়া উঠিয়াছে। আন্দোলনের গতিপথে উদয়াচলে নব সূর্যোদয়ের যুগান্তকারী ঘটনাকেও এই নাটকে সুকৌশলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পরিবর্তিত অবস্থায় প্রাক্তন পদলেহীদের ভোল-পরিবর্তনের উপভোগ্য চিত্রটির অপরূপ বিন্যাস নাটকখানিকে আরও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে।' দেড় টাকা।

বিপর্যয় রঙমহলে অভিনীত। 'কোন নাটকের প্রথম পর্যায়ে উন্নীত হইবার জন্য যে গুণ থাকা দরকার, আলোচ্য নাটকে তাহার সব কিছুই আছে। নানা ঘাতপ্রতিঘাতে নাটকের গতি হইয়াছে দ্রুততর। ডায়ালোগ জোরালো ও স্বচ্ছন্দ-গতি। বিষয়বিন্যাসে বৈচিত্র্য আছে'—

দুই টাকা।

নূতন প্রভাত ৪র্থ সং। 'এই প্রকার সমস্যা লইয়া ও এই ভাবের সত্যদিদৃক্ষা ও সাহসের সঙ্গে লেখা নাটক বাংলায় পড়ি নাই'—**সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়**।

প্লাবন ৩য় সং। নাট্যভারতীতে অভিনীত জনপ্রিয় নাটক। 'নাটকের সংবেদশীলতা ও লিপিচাতুর্য রসপিপাসুদের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে'—**যুগান্তর**। দেড় টাকা।